ডিরেক্টর কর্ত্তৃক উচ্চ ইংরাজী, মধ্য ইংরাজী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত

Cal. Gazett, May 23, 1910

ছোটদের রামায়ণ

সংশোধিত সংস্করণ

— —
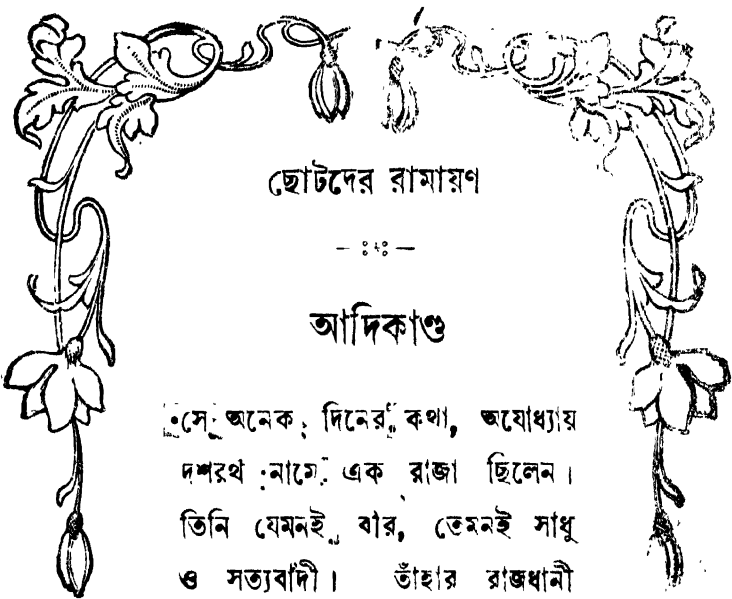
'হাসিখুসি', 'হাসিরাশি', 'বনে জঙ্গলে' প্রভৃতি প্রণেতা

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

প্রণীত

সিটি বুক সোসাইটি

৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৬২শ সংস্করণ]

[মূল্য—

ছোটদের রামায়ণ

— ঃ৹ঃ —

আদিকাণ্ড

সে অনেক দিনের কথা, অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি যেমনই বীর, তেমনই সাধু ও সত্যবাদী। তাঁহার রাজধানী অযোধ্যা লম্বায় প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ এবং চওড়ায় দশ বার ক্রোশের কম ছিল না। এত বড় রাজধানীর সমস্তটাই উচ্চ দেওয়াল দিয়া ঘেরা। এই দেওয়ালের উপরে সারি সারি অস্ত্র সাজান থাকিত। আর তাহার বাহিরে চারি পাশ বেড়িয়া গভীর খাত। শত্রুর সাধ্য কি যে, অযোধ্যার নিকটে আসে।

রাজধানীর ভিতরের শোভা ও ব্যবস্থাও তেমনই সুন্দর। সরযূ নদী কুল্‌-কুল্‌ করিয়া বহিয়া যাইতেছে,

তাহারই তীরে সারি সারি অট্টালিকা—অট্টালিকায় মনোরম শিল্পকার্য; বড় বড় রাজপথ—রাজপথের দুই ধারে ফুলের গাছ। স্থানে স্থানে মনোহর উদ্যান, পুষ্করিণী, সভাগৃহ ও দেবালয় প্রভৃতি। নগরীর প্রায় সকল স্থানেই নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ সারি সারি দোকান। ইহা ছাড়া, অযোধ্যার সৌন্দর্য বাড়াইতে আরও কত কি যে ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

রাজা দশরথ মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজকার্য চালাইতেন। এই মন্ত্রীগণের সকলেই বিদ্যা, বুদ্ধি ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে পরম পণ্ডিত ছিলেন। রাজা ও তাঁহার মন্ত্রীগণ ভাল লোক ছিলেন বলিয়া রাজ্যে অধর্ম বা অবিচার ছিল না। দশরথ যেমন প্রজাদিগকে আপনার পুত্রের ন্যায় যত্নে পালন করিতেন, প্রজারাও তেমনিই তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভালবাসিত এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। এইরূপে তাঁহার রাজ্য পরম সুখের স্থান হইয়া উঠিয়াছিল।

কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নামে দশরথের তিন গুণবতী সুন্দরী রাণী ছিলেন। কিন্তু সকল ধনের বড় ধন পুত্রধন ছিল না বলিয়া রাজার মনে সুখ ছিল না, রাণীদের মনে সুখ ছিল না, রাজভক্ত প্রজাদের মনেও সুখ ছিল না। এক দিন রাজা মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি

পুত্রলাভের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে চাই, আপনাদের ইহাতে কি মত ?”

বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রীগণ কহিলেন, “আমাদের সকলেরই ইহাতে সম্পূর্ণ মত আছে। এখন যজ্ঞ করিবার উপযুক্ত একজন পুরোহিত চাই। মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গ এই কার্যের সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র ; আপনি তাঁহাকে আনিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করুন।”

মহারাজ দশরথ তাঁহাদের কথায় বড়ই আনন্দিত হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে থাকিতেন। তিনি দশরথের বন্ধু লোমপাদ রাজার জামাতা। তাই দশরথ বলিলেন, “ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আমার বন্ধু রাজা লোমপাদের জামাতা, তাঁহাকে আমি নিজেই আনিতে যাইব। আপনারা এখন সরযূ নদীর তীরে যজ্ঞশালা নির্মাণের ব্যবস্থা করুন এবং যজ্ঞকার্য সম্পাদনের জন্য আর যাহা যাহা করিতে হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হউন।” এই বলিয়া রাজা নিজেই অঙ্গদেশে গিয়া মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে লইয়া আসিলেন।

ইহার পর অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। বড় বড় রাজা ভিন্ন অন্য কেহ এই যজ্ঞ করিতে পারিতেন না।

অশ্বমেধ কাহাকে বলে, শুন। একটি সুলক্ষণযুক্ত ঘোড়ার মাথায় জয়পত্র বাঁধিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

এই ঘোড়ার পিছনে পিছনে অনেক সৈন্য-সামন্ত থাকে। এই ঘোড়া বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া এক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিলে তাহাকে বলি দিয়া হোম করা হয়। যদি কোন দেশের রাজা সাহস করিয়া এই ঘোড়াকে আটক করে, তবে পিছনের সৈন্যেরা যুদ্ধ করিয়া ঘোড়া ছাড়াইয়া লয়।

দশরথের এই মহাযজ্ঞে দেশ-বিদেশ হইতে কত যে রাজা, রাজপুত্র, মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অতিথি, ভিক্ষুক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন, তাহার সংখ্যা হয় না। তাঁহাদের সকলকেই উত্তম খাদ্য, উপযুক্ত বাসস্থান এবং প্রচুর অর্থাদি উপহার দেওয়া হইল।

এই যজ্ঞ শেষ করিতে এক বৎসর লাগিল। অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ হইলে মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথকে বলিলেন, "এবার আপনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করুন; এই যজ্ঞ করিলে নিশ্চিত পুত্রলাভ করিবেন।"

তখন মহা আড়ম্বরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ হইল। সেই যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড হইতে লাল কাপড়-পরা এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ উঠিলেন। তাঁহার হাতে উত্তম পায়সে পরিপূর্ণ একখানি সোনার থালা। তিনি দশরথের হাতে পায়সশুদ্ধ থালা দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, ব্রহ্মা এই পায়স পাঠাইলেন। ইহা রাণীদিগকে খাইতে দিন, তাহা হইলেই আপনার ইচ্ছা পূর্ণ

হইবে।” এই বলিয়া সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষটি দেখিতে দেখিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

ব্রহ্মার পায়স পাইয়া দশরথের আনন্দ আর ধরে না। থালাখানি লইয়া তিনি অন্তঃপুরে গেলেন এবং সেই পায়সের অর্দ্ধেক বড় রাণী কৌশল্যাকে দিয়া উহার অর্দ্ধেক সুমিত্রাকে দিতে বলিয়া দিলেন। আর অপর অর্দ্ধেক লইয়া কৈকেয়ীর হাতে দিয়া উহারও অর্দ্ধেক সুমিত্রাকে দিবার জন্য বলিলেন। তখন তিন রাণীতে মিলিয়া মনের আনন্দে পায়স খাইলেন।

এদিকে যজ্ঞও শেষ হইল। ইহার পর কয়েক মাস গত হইলে তিন রাণীর চারিটি পুত্র হইল, বড় রাণী কৌশল্যার একটি, মেজরাণী কৈকেয়ীর একটি এবং ছোট রাণী সুমিত্রার দুইটি। ছেলেদের রূপই বা কি! যে দেখিল, সে-ই মুগ্ধ হইল। এতদিনে দশরথের সকল দুঃখ ঘুচিল। তিনি ভাণ্ডার খুলিয়া দুই হাতে গরীব দুঃখীদিগকে ধনরত্ন বিলাইলেন।

ত্রয়োদশ দিবসে মহর্ষি বশিষ্ঠ কুমারদিগের নামকরণ করিলেন। কৌশল্যার পুত্র সকলের বড়, তাহার নাম হইল রাম; কৈকেয়ীর পুত্রের নাম হইল ভরত; সুমিত্রার দুইটি পুত্র—বড়টির নাম হইল লক্ষ্মণ, আর ছোটটির শত্রুঘ্ন।

শিশুগুলি একটু বড় হইলে চারিটিতে মিলিয়া হাসিয়া

খেলিয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইত; তাহা দেখিয়া রাজা ও রাণীদের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিত। রাজা দশরথ যথা-সময়ে বশিষ্ঠদেবের নিকট শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহারা এমনই মেধাবী এবং এমনই যত্ন করিয়া সকল বিষয় শিখিতে লাগিল যে, অতি অল্প দিনেই নানা বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিল। কি লেখাপড়া, কি ব্যায়াম, কি ধনুর্বিদ্যা—কিছুই তাহাদের শিখিতে বাকী রহিল না। সব চেয়ে বড় রাম আবার সব বিষয়েই যেন সকলের চেয়ে বেশী নিপুণ হইয়া উঠিলেন।

তাহাদের ভাইয়ে ভাইয়ে ভালবাসার কথা শুনিলেও আশ্চর্য হইতে হয়। চারি ভাইয়ের মধ্যে পরস্পর এমনই ভালবাসা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহারা কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারিতেন না। ইহার মধ্যে আবার রামের সহিত লক্ষ্মণের এবং ভরতের সহিত শত্রুঘ্নের যেরূপ ভালবাসা জন্মিয়াছিল, সেরূপ প্রায় দেখা যায় না।

এই সময় একদিন মুনিবর বিশ্বামিত্র হঠাৎ রাজা দশরথের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্র মুনি বড়ই রাগী—বড়ই একরোখা। রাজা তাঁহাকে আদর-অভ্যর্থনা করিয়া উত্তম আসনে বসাইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুনিবর, কি মনে করিয়া এখানে আসিয়াছেন,

দশরথের সভায় বিশ্বামিত্র

বলুন ? আমি আপনার আদেশ পালন করিয়া কৃতার্থ হই।” বিশ্বামিত্র বলিলেন, “মহারাজ, আমি বড় বিপদে পড়িয়াই আপনার নিকটে আসিয়াছি। আমরা যজ্ঞ করিতে বসিলেই ‘মারীচ’ আর ‘সুবাহু’ নামে দুইটি রাক্ষস যজ্ঞস্থলে হাড়, মাংস, ছুড়িয়া দিয়া আমাদের যজ্ঞ নষ্ট করে এবং রাক্ষসেরা নিরীহ মুনিদিগকে ধরিয়া খাইয়া ফেলে। আপনি কয়েক দিনের জন্য আপনার রামকে আমার সঙ্গে দিন। রাম তাহাদিগকে মারিয়া আমাদের যজ্ঞের বিঘ্ন দূর করিবেন।”

রাজা দশরথ ত মুনির কথা শুনিয়াই মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। রাম ছেলেমানুষ, সে কি রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে ? বিষম চিন্তায় রাজা যার-পর-নাই কাতর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কাতর হইয়াই বা আর কি করিবেন ? ‘মুনির ইচ্ছা পূর্ণ করিব’ বলিয়া পূর্বেই যখন কথা দিয়াছেন, তখন রামকে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইতেই হইল। লক্ষ্মণও রামের সঙ্গে গেলেন।

কিছুদূর যাইবার পর বিশ্বামিত্র রামকে ‘বলা’ ও ‘অতিবলা’ নামে দুইটি বিদ্যা শিখাইলেন। এই দুই বিদ্যার বলে রামের ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট রহিল না এবং দেহের বল খুব বাড়িয়া গেল।

তারপর আবার সকলে চলিতে লাগিলেন। সরযূ নদী

পার হইয়া তাঁহারা ভয়ানক একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। সেখানে 'তাড়কা' রাক্ষসীর বাস। তাড়কার নামেই সকলে ভয়ে কাঁপে। সে যাহাকে পায়, ধরিয়া খায়। রাম, লক্ষ্মণকে দেখিয়া তাড়কা মার্-মার্ করিয়া ছুটিয়া আসিল। তখন রাম এক বাণে তাহার একটা হাত এবং লক্ষ্মণ এক বাণে তাহার নাক কাটিয়া দিলেন। তবুও সে ক্ষান্ত হইল না। ধূলা উড়াইয়া, চারিদিক্ অন্ধকার করিয়া রাম-লক্ষ্মণের দিকে গাছ-পাথর ছুড়িতে লাগিল।

এই তাড়কা বড় যে সে রাক্ষসী ছিল না; তাহার দেহে হাজার হাতীর বল। হাত কাটা গিয়াছে, তবুও তাহার বিক্রম দেখে কে? সে হাঁ করিয়া রামকে গিলিতে আসিল। তখন রাম একটা তীক্ষ্ণ বাণ ছুড়িয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন।

ইহার পর বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে লইয়া আপনার আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আরও অনেক মুনি থাকিতেন। তাঁহারা ভাই দুইটিকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। পরদিন বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করিতে বসিলে তাড়কা রাক্ষসীর ছেলে মারীচ আর সুবাহু তাঁহার যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসিল; রাম মারীচের বুকে এমন এক বাণ মারিলেন যে, সে ঘুরিতে ঘুরিতে সমুদ্রের ধারে গিয়া পড়িল

তাড়কা রাক্ষসী

আর সুবাহু বাণ খাইয়া সেই খানেই পড়িয়া মরিয়া গেল। মুনিদের আনন্দ দেখে কে!

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ শেষ হইলে, তিনি রাম-লক্ষ্মণকে লইয়া মিথিলায় জনক রাজার যজ্ঞ দেখিতে চলিলেন। যাইতে যাইতে পথে সন্ধ্যা হইল; তাঁহারা এক নদীর তীরে রাত্রি যাপন করিলেন। পথে আরও দুই রাত্রি কাটিল। ইহার পরদিন সকালে তাঁহারা চলিতে আরম্ভ করিয়া একটু পরেই দূর হইতে জনক রাজার রাজধানী মিথিলা নগর দেখিতে পাইলেন। তাহার সুন্দর শোভা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন, এমন সময় পাশেই একটি পুরাতন আশ্রম তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পড়িল। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুনিবর, এ আশ্রমটি কাহার?" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "রাম, ইহা গৌতম মুনির আশ্রম; এখন কিন্তু গৌতম এখানে থাকেন না। তাঁহার পত্নী অহল্যা একটা অপরাধ করিয়াছিলেন, তাই মুনি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কৈলাস পর্বতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি পত্নীকে এই শাপ দিয়াছেন,—'তুই এখানে পাথর হইয়া পড়িয়া থাক্, কেহ তোকে দেখিতে পাইবে না, বাতাস ভিন্ন কিছু খাইতেও পাইবি না! বহু কাল পরে দশরথের পুত্র রাম এখানে আসিবেন; তখন তাঁহার পূজা করিস, তাহা হইলেই তুই শাপ হইতে মুক্ত হইবি।' এখন রাম, তুমি

এখানে আসিয়াছ, চল, একবার অহল্যাকে দেখিয়া যাইবে।”

বিশ্বামিত্রের কথায় রাম অহল্যাকে দেখিতে চলিলেন। অহল্যা ছাইয়ের ভিতর ছিলেন। রাম তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইলেন, আবার তিনিও রামের পূজা করিলেন। অহল্যা এত দিন একমনে যাঁহার তপস্যা করিতেছিলেন, আজ সেই রামের দেখা পাইয়া শাপমুক্ত হইলেন।

ইহার পর মিথিলায় সকলে উপনীত হইলে, রাজা জনক তাঁহাদের যার-পর-নাই আদর-অভ্যর্থনা করিলেন। মুনির মুখে রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহাদের গুণের কথা শুনিয়া রাজার বড়ই আনন্দ হইল।

জনক রাজা এক সময়ে লাঙ্গল দিয়া যজ্ঞের স্থান চষিতেছিলেন। হঠাৎ লাঙ্গলের মুখে একটি পরমা সুন্দরী কন্যা বাহির হইল। তিনি আদর করিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলেন আর তাহার নাম রাখিলেন—‘সীতা’। সীতাকে তিনি ঠিক নিজের মেয়ের মতই আদর-যত্নে পালন করিতে লাগিলেন।

জনকের ঘরে প্রকাণ্ড একটা ধনুক ছিল, উহা শিবের ধনুক। রাজার প্রতিজ্ঞা ছিল, যিনি এই ধনুকে গুণ দিতে পারিবেন, তাঁহারই সহিত সীতার বিবাহ দিবেন। এই কথা

২ শিবের ধনুক-ভঙ্গ

শুনিয়া অনেক বড় বড় বীর ঐ ধনুকে গুণ দিতে আসিলেন। কিন্তু গুণ দেওয়া দূরে থাক্, ধনুকখানি কেহ একটু নড়াইতেও পারিলেন না। বিশ্বামিত্র সেই ধনুকখানি রামকে দেখাইবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন।

মুনির ইচ্ছায় জনক শিবের ধনুকটি আনাইলেন। রাম ধনুকটি বাম হাতে ধরিয়া, উহাতে গুণ পরাইয়া এমন জোরে টান্ দিলেন যে, মড়্-মড়্ করিয়া ধনুক ভাঙ্গিয়া একেবারে দুইখানি হইয়া গেল। সকলে দেখিয়া অবাক্—রামের গায়ে কি বল! জনক রাজা বলিলেন,—"রাম ধনুক ভাঙ্গিলেন, ভালই হইল! রামকে দেখিয়া অবধি তাঁহার উপর আমার স্নেহ জন্মিয়াছিল; এখন তাঁহার সহিত সীতার বিবাহ দিয়া সুখী হইব।" এই বলিয়া তিনি দশরথকে আনিবার জন্য অযোধ্যায় দূত পাঠাইয়া দিলেন।

দূতের মুখে সকল কথা শুনিয়া দশরথ বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং ভরত, শত্রুঘ্ন ও পুরোহিত বশিষ্ঠ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া খুব জাঁকজমক করিয়া মিথিলায় আসিলেন। রাজা জনক বিস্তর সম্মান দেখাইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

জনক রাজার নিজের একটি মেয়ে ছিল, তাহার নাম ঊর্মিলা, আর দুইটি ভাইঝি ছিল—একটির নাম মাণ্ডবী,

অন্যটির নাম শ্রুতকীর্তি। পুরোহিত বশিষ্ঠ প্রভৃতি কথা তুলিলেন,—দশরথের চারিটি ছেলের সহিত এই চারিটি মেয়ের বিবাহ হইলে বেশ হয়। রাজা জনক এই প্রস্তাবে বড়ই আনন্দিত হইলেন! তখন শুভদিন দেখিয়া রামের সহিত সীতার, লক্ষ্মণের সহিত ঊর্মিলার, ভরতের সহিত মাণ্ডবীর আর শত্রুঘ্নের সহিত শ্রুতকীর্তির বিবাহ হইয়া গেল। এই বিবাহ উপলক্ষে মিথিলা-রাজ্যে খুব আনন্দ-উৎসব হইল। রাজা গরীব-দুঃখীদিগকে দুই হাত ভরিয়া খাদ্য ও অর্থ বিতরণ করিলেন। তাহারা 'জয়' 'জয়' রবে সকলের কল্যাণ কামনা করিতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতেই রাজা দশরথ অযোধ্যায় ফিরিবার জন্য জনকের কাছে বিদায় চাহিলেন। জনক রাজা বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ ধনরত্ন, দাস-দাসী, হাতী-ঘোড়া কত কি যে দিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দশরথ ছেলে, বউ আর সেই সমস্ত উপহার লইয়া দেশে চলিলেন।

তাঁহারা কতক দূর গিয়াছেন, এমন সময় ঝড়ের ন্যায় ভয়ানক শব্দ শুনিয়া সকলে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। যাঁহার পায়ের দাপে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে, পর্বত গুঁড়া হইয়া যায়, যাঁহাকে দেখিলে বড় বড় বীরেরাও অজ্ঞান হইয়া পড়ে, হঠাৎ সেই পরশুরাম আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার হাতে ধনুক,

কাঁধে প্রকাণ্ড কুঠার। তিনি রামকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুনিলাম, তুমি না কি শিবের ধনুক ভাঙ্গিয়াছ? বেশ! এখন আমার এই ধনুকটিতে গুণ পরাইয়া একবার টানিয়া দেখাও ত! দেখি, তুমি কত বড় বীর! তারপর তোমার সহিত যুদ্ধ করিব।" দশরথ ত ভয়ে জড়সড়। পরশুরামের বল-বিক্রম ও উগ্র স্বভাবের কথা তিনি ভাল রকমেই জানিতেন। আর জানিতেন, তাঁহাদের ক্ষত্রিয় জাতিটার উপরই পরশুরামের রাগ; কেন না, একজন ক্ষত্রিয় তাঁহার পিতাকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। যাহা হউক, দশরথকে কাতর দেখিয়া রাম পরশুরামের নিকট অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, তিনি কিন্তু কোন কথাই শুনিলেন না। তাঁহার মুখে সেই একই কথা, "আগে আমার ধনুকে গুণ পরাইয়া টান, তারপর তোমার সহিত যুদ্ধ করিব।" তখন রাম তাঁহার ধনুকে অনায়াসে গুণ পরাইয়া এমন জোরে টান দিলেন যে, পরশুরাম তাঁহার শক্তি দেখিয়া ভয়ে স্তম্ভিত হইলেন। শেষে তিনি রামের অনেক প্রশংসা করিয়া বিষণ্ণ মনে মহেন্দ্র পর্বতে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনায় রাজা দশরথ এবং তাঁহার সহযাত্রিগণের কিরূপ আনন্দ হইল, তাহা বুঝিতেই পার।

ইহার পর যথাসময়ে সকলে অযোধ্যায় পৌঁছিলেন। দেশবাসীদের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে তিন রাণী সাদরে বধূবরণ করিয়া ঘরে লইলেন এবং বহুমূল্য বসন-ভূষণে তাঁহাদের অঙ্গ ভরিয়া দিলেন।
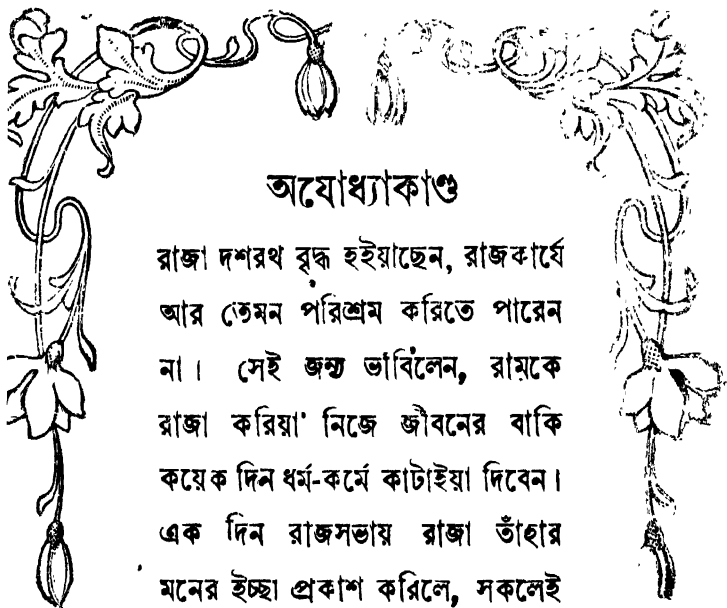
অযোধ্যাকাণ্ড

রাজা দশরথ বৃদ্ধ হইয়াছেন, রাজকার্যে আর তেমন পরিশ্রম করিতে পারেন না। সেই জন্য ভাবিলেন, রামকে রাজা করিয়া নিজে জীবনের বাকি কয়েক দিন ধর্ম-কর্মে কাটাইয়া দিবেন। এক দিন রাজসভায় রাজা তাঁহার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সকলেই আনন্দের সহিত সম্মতি দিলেন। রামের অভিষেকের দিন স্থির হইয়া গেল।

শুভদিন সমাগত! চারিদিকেই নাচ-গান, আমোদ-আহ্লাদ, বাদ্য-কোলাহল। লোকে ঘর-দুয়ার সাজাইতেছে, শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইতেছে দ্বারে দ্বারে মঙ্গল-কলস দিতেছে। আনন্দে যেন সারা দেশ মাতিয়া উঠিল।

কৈকেয়ীর এক দাসী ছিল, তাহার নাম মন্থরা। মন্থরার পিঠে একটা কুঁজ ছিল, তাই লোকে তাহাকে 'কুঁজী' বলিয়া ডাকিত। এই কুঁজীর মন হিংসা আর কুটিলতায় ভরা। আজ কিসের উৎসব—জিজ্ঞাসা করিয়া কুঁজী শুনিল যে, রাম রাজা হইবেন, তাই এত ধুমধাম, তাই লোকের এত আনন্দ। কুঁজীর ইহা অসহ্য বোধ হইল। সে রাগে গর্-গর্ করিতে লাগিল। দশরথ কৈকেয়ীকে এত ভালবাসেন, আর রাজা করিবেন কি না কৌশল্যার ছেলে রামকে! কুঁজী মনের বিষে জ্বলিতে জ্বলিতে কৈকেয়ীর কাছে ছুটিল।

রাণী কৈকেয়ী রামকে ভরতের মতই ভালবাসিতেন। কুঁজীর মুখে রাম রাজা হইবেন শুনিয়া তিনি বড়ই আনন্দিত হইলেন; আর কুঁজী সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে এই সুসংবাদ আনিয়া দিল বলিয়া আপনার গলার হার খুলিয়া তাহাকে পুরস্কার দিলেন।

কুঁজী ইহাতে আরও জ্বলিয়া গেল; হার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "রাণী, তুমি চিরকাল সোজাই বুঝিয়া থাক। এ সংবাদে তোমার আনন্দ হইতে পারে; কিন্তু আমরা তোমার হিতৈষী, তোমার যাহাতে ভাল হয়, তাহাই খুঁজি; আমাদের ইহাতে কিছুমাত্র আনন্দ নাই। রাম তোমাকে ভক্তি করে, ইহাতেই তুমি গলিয়া যাও; কিন্তু

রামের মনের ভিতর যে কি, তাহা ত তুমি জান না। রাম যদি রাজা হয়, প্রজারা তাহারই অনুগত হইবে; সে যাহা বলিবে, তাহাই শুনিবে, তখন রামকে আর কাহারাও মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে না। সে সময় কি আর রাম তোমাকে এখনকার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে; না, ভরতের উপর তাহার এখনকার মত স্নেহ-ভালবাসাই থাকিবে? তখন হয়ত ভরতকে সে মারিয়াই ফেলিবে; না হয়, রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবে। রাজা তোমাকে খুবই ভালবাসেন, সেই সাহসে এতদিন রামের মা কৌশল্যাকে তুমি গ্রাহ্যই কর নাই, কিন্তু রাম রাজা হইলে কৌশল্যা কি তাহার শোধ লইতে ছাড়িবে? তাই আমার ভয় হইতেছে, এতদিনের পর বুঝি তোমার প্রভুত্ব যায়, ভরতও বুঝি পথের ভিখারী হয়!"

এই রকম নানা কথায় কুঁজী কৈকেয়ীর মন বিগ্‌ড়াইয়া দিল। আর তাঁহার সে আনন্দ রহিল না। তিনি মনের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিলেন না। তখন কুঁজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্থরা, এখন উপায় কি, বল্ দেখি?"

মন্থরা বলিল, "রাণী, রাজা যখন তোমাকে খুবই ভালবাসেন তখন আর উপায়ের অভাব কি? তোমার মনে

আছে কি না, জানি না—একবার অসুরদের সহিত যুদ্ধে রাজা আহত হন। তুমি তখন প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়াছিলে। রাজা তুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন। তখন তুমি সে বর লও নাই, সময়-মত লইবে—এই কথা বলিয়াছিলে। এখন রাজাকে আবার সত্য করাইয়া সেই দুইটি বর চাহিয়া লও। এক বরে চৌদ্দ বৎসরের জন্য রামকে বনে পাঠাইয়া দাও; আর এক বরে তোমার ভরতকে রাজা কর। রাম দেশে থাকিলে ভরতের শত্রুতা করিতে পারে, তাই তাহাকে একেবারে দেশছাড়া করাই নিরাপদ।”

কৈকেয়ী তখন ইহাই উত্তম পরামর্শ বলিয়া বুঝিলেন। তারপর কুঁজীর কথামত গায়ের অলঙ্কার খুলিয়া, সামান্য বস্ত্র পরিয়া ঘরের মেঝেতে তিনি শুইয়া রহিলেন।

রাজা দশরথ অভিষেকের সকল আয়োজন শেষ করিয়া এই সুসংবাদ দিবার জন্যে অগ্রেই কৈকেয়ীর নিকটে আসিলেন। কিন্তু আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বড়ই কষ্ট হইল। তিনি বার বার কৈকেয়ীকে তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনই উত্তর পাইলেন না। দেখিলেন, রাণী চক্ষের জলে ভাসিতেছেন।

রাজা বলিলেন, “কৈকেয়ী, আজ শুভদিন; তোমাকে আনন্দের সংবাদ দিতে আসিলাম, কিন্তু তোমার এইরূপ

অবস্থা দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট হইতেছে। তুমি কি চাও, বল, আমি তোমাকে তাহাই দিব।”

এইবার কৈকেয়ীর মুখে কথা বাহির হইল। তিনি দশরথকে পূর্বের বর-দানের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং রাজা আজ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন এই কথা পুনরায় রাজাকে দিয়া বলাইয়া লইলেন। দশরথ যে পরম সত্যবাদী ইহা রাণী জানিতেন, সুতরাং এখন আর বর চাহিতে তাঁহার কোন বাধা রহিল না। তিনি স্বচ্ছন্দে এক বরে রামের চতুর্দশ বৎসর বন-গমনের এবং অন্য বরে ভরতের রাজা হওয়ার প্রস্তাব করিয়া বসিলেন।

দশরথ এই নিষ্ঠুর কথা শুনিয়াই মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন! কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, তখন তিনি অনেক কাকুতি-মিনতি করিলেন; কিন্তু কৈকেয়ী তাঁহার কোন কথাই শুনিতে চাহিলেন না। দশরথ আবার মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তারপর কৈকেয়ী রামকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, “রাম, ভরত রাজা হয়, আর তুমি চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে যাও, মহারাজের এখন ইহাই ইচ্ছা। এ কথা বলিতে লজ্জিত হইতেছেন বলিয়াই তাঁহার এই অবস্থা! এখন তুমি তোমার কর্তব্য পালন কর।”

কোথায় রাম রাজা হইবেন, না, চৌদ্দ বৎসর বনবাস। এক মুহূর্তে তাঁহার সকল আশাই নির্ম্মূল হইল। ইহাতেও কিন্তু তিনি ধৈর্য্য হারাইলেন না; বলিলেন, "মা, ভরত রাজা হইবে, ইহা ত সুখের কথা। বাবা যখন বলিয়াছেন, তখন আজই আমি বনে যাইব।"—এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে পুনরায় দশরথের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। তিনি সম্মুখে রামকে দেখিয়া, কেবল 'রাম' এই কথাটি বলিয়াই নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন।

রাম বলিলেন, "পিতা, আপনি এত কাতর হইতেছেন কেন? আপনার সত্য রক্ষার জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি, রাজ্য ত কোন্ ছার! আর প্রাণের ভাই ভরত রাজা হইবে, ইহাতেই বা আমার কষ্টের কারণ কি? আপনি দুঃখ করিবেন না, আমি এখনই বনে যাইতেছি।" এই বলিয়া পিতার ও বিমাতা কৈকেয়ীর চরণবন্দনা করিয়া রাম সেই গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

রাণী কৌশল্যা পুত্রের মঙ্গলের জন্য এতক্ষণ পূজাগৃহে ছিলেন। রাম পিতার নিকট হইতে সেখানে যাইয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন এবং তাঁহাকে সকল কথা জানাইলেন। তখন কৌশল্যার হৃদয়ে যে কি দারুণ আঘাত লাগিল, আর কিরূপ করুণভাবে যে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, তাহা বলিয়া

বুঝান যায় না। মাতাকে অনেক কষ্টে সান্ত্বনা দিয়া রাম সীতার কাছে আসিলেন, কিন্তু কি বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইবেন, স্থির করিতে না পারিয়া নিজেই চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন।

সীতার কথা আর কি বলিব! এই নিদারুণ অবিচারের কথা শুনিয়া যাতনায় তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি শুধু এই কথা বলিলেন, "আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।"

লক্ষ্মণ কৈকেয়ীর নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। বৃদ্ধ অবস্থায় বুদ্ধিহীন হইয়াছেন বলিয়া পিতার নিন্দা করিতে লাগিলেন। রামকে বলিলেন, "দাদা, এমন অবিচার সহ্য করা অন্যায়। আমি কিছুতেই তোমাকে বনে যাইতে দিব না। যদি রাজ্যের সকলে একদিক হইয়াও আসে, আমি একাই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমাকে সিংহাসনে বসাইব।"

লক্ষ্মণ রামকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন। তাঁহার প্রতি এরূপ অবিচার দেখিয়া লক্ষ্মণের রাগ হইতে পারে, রাম ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। তথাপি পিতৃনিন্দার জন্য লক্ষ্মণকে অনেক অনুযোগ করিলেন; বলিলেন, "ভাই, সত্যরক্ষাই ধর্ম। পুত্র যদি পিতার সত্য রক্ষা না করে, সে পুত্র পুত্রই নয়।" এইরূপ অনেক বুঝাইবার পরে লক্ষ্মণ

শান্ত হইলেন বটে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনিও রামের সহিত বনে যাইবেন।

সুমন্ত্র রথ সাজাইয়া আনিলে রাম-লক্ষ্মণ বল্কল পরিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন, সীতা সহজ বেশেই ছিলেন। তারপর রথ ছুটিতে আরম্ভ করিলে, অযোধ্যার বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের পিছনে ছুটিল। বৃদ্ধ রাজা দশরথও বিলাপ করিতে করিতে পাগলের ন্যায় ছুটিলেন! কিন্তু কিছুদূর গিয়াই তিনি আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থায় চারদিন কাটিল, তারপর তাঁহার মৃত্যু হইল।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা যেদিন রাজপুরী ছাড়িলেন, সেইদিনই সন্ধ্যাকালে তমসার তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সারারাত বিশ্রাম করিয়া পরদিন আবার রথে চড়িলেন। গঙ্গার ধারে গুহক চণ্ডালের দেশ। গুহক রামের পরম বন্ধু। রথ গঙ্গার ধারে পৌঁছিলে, গুহক রামকে তাঁহার নিজের দেশে রাজা করিয়া রাখিবার জন্য কতই না যত্ন চেষ্টা করিল; কিন্তু রাম বলিলেন, "ভাই, পিতার আদেশ কি অমান্য করিতে পারি? চৌদ্দ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া আবার তোমার সঙ্গে দেখা করিব।"

এখান হইতে রথ ফিরাইয়া দিয়া তাহারা সন্ন্যাসীর বেশে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। এখন দুই ভাইয়ের মাথায় জটা, পরিধানে গাছের বাকল, হাতে ধনুক। তাঁহাদের খাদ্য —বনের ফল, পানীয়—ঝরণার জল, আশ্রয়—বৃক্ষের তল।

এই ভাবে অনেক বন-জঙ্গল পার হইয়া তাঁহারা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তার পর চিত্রকূট পর্বতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাম যখন বনে যান, ভরত ও শত্রুঘ্ন তখন তাঁহাদের মামার বাড়ী নন্দীগ্রামে ছিল। এত সব গোলযোগের কথা তাঁহারা কিছুই জানিতেন না। পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তাঁহারা অযোধ্যায় আসিয়া সবই জানিতে পারিলেন।

সকল কথা শুনিয়া রাগে, দুঃখে ও ঘৃণায় ভরত এমন উত্তেজিত হইলেন যে, তাঁহার কাছে কৈকেয়ীর মুখ দেখানই ভার হইয়া উঠিল। আর শত্রুঘ্নের লাথি, চড় খাইতে খাইতে কুঁজী ত প্রায় আধমরা!

তার পর দুই ভাই মাতা কৌশল্যার পায়ের উপর পড়িয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। তাঁহাদিগকে বুকে ধরিয়া কৌশল্যার ব্যথা কতকটা জুড়াইল।

অবশেষে তাঁহারা রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে ফিরাইয়া

আনিবার জন্য বনে গমন করিলেন। চিত্রকূট পর্বতে চারি ভাইয়ের মিলন হইল। এত শোকের মধ্যেও সেই মিলন কি মধুর! ভরত রামের পায়ে ধরিয়া কাঁদেন, রাম তাঁহাকে বুকে লইয়া চোখের জলে ভাসেন। রামকে ফিরাইয়া আনিতে ভরতের কি আগ্রহ—কি কাতর অনুনয়! কিন্তু রাম পিতার সত্য পালন করিতে বনে আসিয়াছেন, কিরূপে ফিরিবেন? তিনি সে কথা ভরতকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন। তখন ভরত বলিলেন, "দাদা, যদি কোন মতেই ফিরিবে না, তবে তোমার খড়ম্ জোড়া দাও! ঐ খড়ম্ই আমাদের রাজা হইবে। আমি অযোধ্যায় যাইব না; নন্দীগ্রামে রাজসিংহাসনে খড়ম্ রাখিয়া, তাহার নীচে বসিয়া রাজকার্য্য চালাইব। কিন্তু মনে রাখিও, যেদিন চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইবে, তাহার পরদিনেই যদি তোমাকে দেখিতে না পাই, তবে আমি আগুনে ঝাঁপ দিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব!" রাম ভরতের ব্যবহারে যার-পর-নাই তুষ্ট হইয়া খড়ম্ জোড়া দিলেন। ভরত উহা মাথায় তুলিয়া লইয়া শত্রুঘ্নের সহিত নন্দীগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

রাম, লক্ষ্মণ পূর্বেই ভরতের মুখে দশরথের মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছিলেন। ভরত চলিয়া আসিলে পিতার শোকে কাতর হইয়া তাঁহারা বালকের ন্যায় রোদন ও হাহাকার করিতে লাগিলেন।
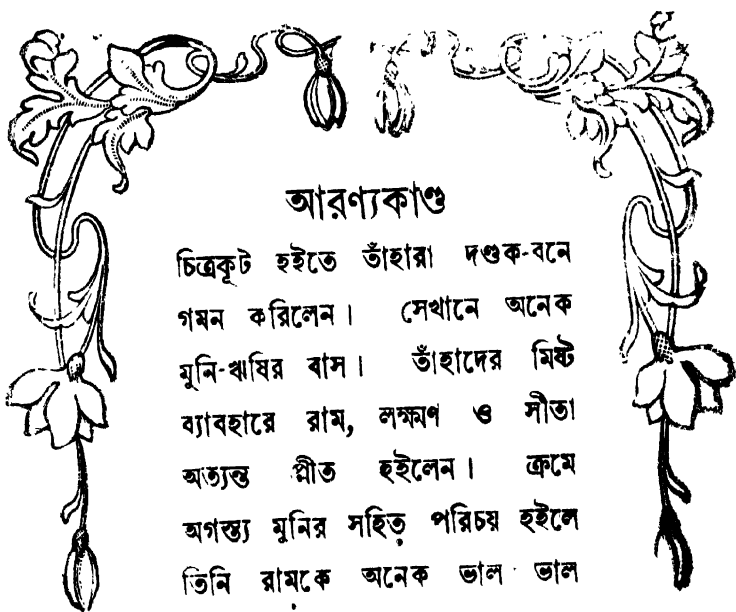
আরণ্যকাণ্ড

চিত্রকূট হইতে তাঁহারা দণ্ডক-বনে গমন করিলেন। সেখানে অনেক মুনি-ঋষির বাস। তাঁহাদের মিষ্ট ব্যাবহারে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অত্যন্ত প্রীত হইলেন। ক্রমে অগস্ত্য মুনির সহিত পরিচয় হইলে তিনি রামকে অনেক ভাল ভাল অস্ত্র প্রদান করিলেন। রাম বলিলেন, "ঠাকুর, আমরা একটু ভাল যায়গা খুঁজিতেছি; সেখানে কুটির বাঁধিয়া কিছুদিন কাটাই, ইহাই ইচ্ছা।" অগস্ত্য বলিলেন, "তাহা হইলে তোমরা পঞ্চবটী বনে যাও, সেখানকার শোভা বড়ই সুন্দর; ফল, ফুল, জল—সবই সেখানকার ভাল।" ইহা শুনিয়া তাঁহারা পঞ্চবটী বনে গেলেন।

পঞ্চবটী বনে জটায়ু পক্ষী বাস করিত। দশরথের সহিত তাহার খুবই বন্ধুত্ব ছিল। পক্ষীর সহিত পরিচয় হইলে, রাম লক্ষ্মণ ও সীতা তাহাকে প্রণাম করিলেন।

জটায়ু খুসী হইয়া বলিল, "তোমরা এখানেই থাক। আমি বুড়া হইয়াছি, তথাপি যতটুকু পারি তোমাদের সাহায্য করিব।" অগস্ত্য মুনি ও জটায়ু পক্ষীর পরামর্শে তাঁহারা কুটীর বাঁধিয়া পঞ্চবটীতেই বাস করিতে লাগিলেন।

জনস্থান নামক বনের এক অংশকেই পঞ্চবটী বলা হইত। এই জনস্থানে অনেক রাক্ষসের বাস। এখানে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বেশ সুখেই দিন কাটাইতেছিলেন; হঠাৎ একদিন 'সূর্পণখা' নামে এক রাক্ষসী আসিয়া বিষম গোল বাধাইল। সে একেবারে রামের কাছে গিয়া বলিল, "আমি রাজার বোন, বড় ঘরের মেয়ে, তুমি আমাকে বিয়ে কর।" রাম সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন দেখিয়া সে লক্ষ্মণকে ধরিয়া বসিল। কিন্তু তিনিও তাহার কথায় কান দিলেন না। তখন রাক্ষসী প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া সীতাকে খাইতে গেল। এতটা স্পর্দ্ধা কে সহ্য করিতে পারে? লক্ষ্মণ তখনই এক বাণে তাহার নাক-কান কাটিয়া দিলেন। রাগে, দুঃখে ও যাতনায় চীৎকার করিতে করিতে সূর্পণখা পলাইয়া গেল।

এই রাক্ষসী লঙ্কার রাজা রাবণের ভগিনী। জনস্থানে খর ও দূষণ নামে তাহার দুই মাসতুতো ভাই থাকিত। সূর্পণখা তাহাদের কাছে গিয়া আপনার দুঃখ জানাইল।

ভগিনীর দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহারা এমন ভয়ানক চটিয়া গেল যে, এক সঙ্গে চৌদ্দ হাজার রাক্ষস জড় করিয়া—শেল, শূল, খড়্গ ইত্যাদি অস্ত্র লইয়া তখনই রাম, লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিল কিন্তু রামের সম্মুখে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য। দেখিতে দেখিতে তিনি চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকেই যমালয়ে পাঠাইলেন! খর ও দূষণ যে অত বড় ষণ্ডা, তাহারাও প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিল না।

'অকম্পন' নামে একটা রাক্ষস কোন গতিকে রক্ষা পাইয়াছিল। সে গিয়া রাবণকে এই বিপদের কথা বলিল। সই সময় সূর্পণখাও হা-হুতাশ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লঙ্কায় উপস্থিত হইল আর বিনাইয়া বিনাইয়া অনেক মিথ্যা কথা বলিয়া তাহার দাদাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। ভগিনীর অপমানে রাবণ ত একেবারে রাগে অগ্নিশর্ম্মা। সে তখনই যুদ্ধে যায় আর কি! অকম্পন বলিল, "অমন কাজও করিও না। রামের কাছে গেলে আরে ফিরিতে হইবে না। তার চেয়ে মারীচকে পাঠাও। সে অনেক মায়া জানে। তাহার সাহায্যে রামকে জব্দ করিতে পারিবে।"

এ কোন্ মারীচ, জান? রামের বাণ খাইয়া একবার যে সমুদ্রের তীরে আসিয়া ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল, এ সেই

মারীচ। রাবণ তাহাকে বলিল, "আমার সঙ্গে পঞ্চবটীতে চল; রাম, লক্ষ্মণ মানুষ হইয়া রাক্ষসের অপমান করে! আমি ইহার প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িব না। তোমাকে সোনার হরিণ সাজিয়া আমাকে সাহায্য করিতে হইবে। সোনার হরিণ দেখিলে সীতার লোভ জন্মিবে। সীতার অনুরোধে রাম, লক্ষ্মণ তোমাকে ধরিতে যাইবে। তোমার পিছনে পিছনে ছুটিয়া ক্রমে তাহারা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিবে, সেই সুযোগে আমিও সীতাকে চুরি করিয়া আনিব।"

রাবণ মনে মনে যাহা আঁটিল, কাজেও তাহাই করিল। মারীচ প্রথমে ইহাতে সম্মত হয় নাই; কেন না, রামকে সে ভাল রকমই চিনিয়াছিল। কিন্তু রাবণের আদেশ পালন না করিলে রক্ষা নাই, কাজেই তাহাকে রাজী হইতে হইল।

ইহার পর মারীচ একদিন রাবণের সহিত পঞ্চবটীতে গিয়া রামের কুটীরের সম্মুখে সোনার হরিণের রূপ ধরিয়া খেলা করিতে লাগিল। সীতা সুন্দর হরিণটি দেখিয়া রামকে উহা ধরিয়া দিতে বলিলেন। লক্ষ্মণকে পাহারায় রাখিয়া রাম হরিণ ধরিতে গেলেন। হরিণ পলাইল; রামও পিছনে পিছনে ছুটিলেন! অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাকে ফিরিতে না দেখিয়া সীতা লক্ষ্মণকে তাঁহার সন্ধানে পাঠাইলেন। এই অবসরে রাবণ সীতাকে লইয়া লঙ্কায় পলাইল।

সোনার হরিণ ও সীতা

রাম, লক্ষ্মণ ঘরে ফিরিয়া দেখেন, সীতা নাই। তখন দুই ভাই বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর সমস্ত বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত তন্ন তন্ন করিয়া সীতার খোঁজ করিতে লাগিলেন।

রাবণ যখন সীতাকে লইয়া পলায়, তখন সীতার কান্না শুনিয়া জটায়ু রথ আটকাইয়াছিল। বৃদ্ধ ও দুর্বল হইলেও জটায়ু কম যুদ্ধ করে নাই এবং রাবণকে নাকাল করিতেও ছাড়ে নাই। কিন্তু প্রাচীন শরীর, ক্রমেই শ্রান্ত হইয়া পড়িল। তখন রাবণ যুৎ পাইয়া খড়্গ দিয়া তাহার ডানা কাটিয়া ফেলিল। রাম-লক্ষ্মণকে এই দুঃসংবাদ দিবার জন্যই যেন সে বাঁচিয়াছিল। দুই ভাই সীতার সন্ধান করিতে করিতে তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহাদিগকে সকল কথা বলিয়াই সে প্রাণত্যাগ করিল। পিতার বন্ধু জটায়ুর মৃত্যুতে তাঁহাদের দুঃখের অবধি রহিল না। যাহা হউক, যথারীতি তাহার সৎকার করিয়া রাম, লক্ষ্মণ আবার সীতার সন্ধানে বাহির হইলেন।

গোদাবরী-তীরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে তাঁহারা 'কবন্ধ' নামে এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। তাহার মাথা নাই, কপালে একটি মাত্র চোখ আর মুখ ঠিক পেটের উপর। রাক্ষসের একখানা হাত লম্বায় প্রায় চারি ক্রোশ। সেই

হাত দিয়া সে হাতী, ঘোড়া, সিংহ, বাঘ—যাহা খুশী ধরিয়া খায়। রাম তাহাকে বধ করিলেন।

এই কবন্ধ বাস্তবিক রাক্ষস ছিল না। এক মুনির শাপে তাহার এই দুর্দশা হইয়াছিল। মুনি বলিয়াছিলেন, "রামের হাতে মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত তোর উদ্ধার নাই।" আজ সে শাপমুক্ত হইয়া দিব্য শরীর পাইল। তার পর রাম, লক্ষ্মণের দুঃখের কথা শুনিয়া বলিল, "তোমরা ঋষ্যমূক পর্বতে যাও; সেখানে বানরদের রাজা সুগ্রীবের দেখা পাইবে। সুগ্রীব বড় দুঃখেই দেশ ছাড়িয়া সেই পর্বতে গিয়া লুকাইয়া আছে। তোমরা তাহাকে সাহায্য করিলে এই বিপদে সেও তোমাদের সাহায্য করিবে।"
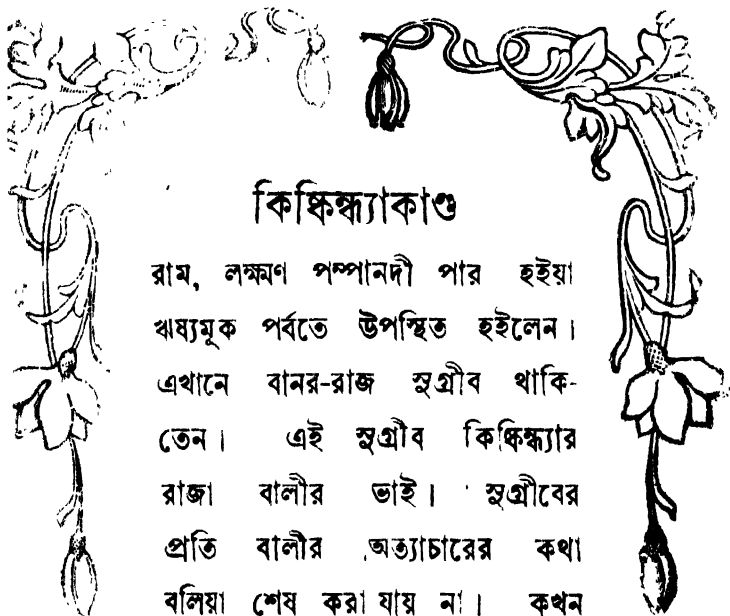
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

রাম, লক্ষ্মণ পম্পানদী পার হইয়া ঋষ্যমূক পর্বতে উপস্থিত হইলেন। এখানে বানর-রাজ সুগ্রীব থাকিতেন। এই সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালীর ভাই। সুগ্রীবের প্রতি বালীর অত্যাচারের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। কখন বালী তাঁহাকে মারিয়া ফেলে সেই ভয়ে সুগ্রীব এই পর্বতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন।

বালীর বল-বিক্রম অদ্ভুত। তিন ভুবনের সব বীরকে জয় করিবার জন্য একদা রাবণ বালীর কাছে গিয়া বলিল, "আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব!" বালী তখন সমুদ্রের তীরে বসিয়া পূজা করিতেছিলেন; আড় চোখে একবার রাবণকে দেখিয়া লইলেন। রাবণ তখন বালীকে মারিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বালী পূজা করা বন্ধ না করিয়া, নিঃশব্দে রাবণের গলায় নিজের লেজটি জড়াইয়া তাহাকে

একে একে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চারি সমুদ্রের মধ্যে ডুবাইয়া পূজা শেষ করিলেন। জল খাইয়া পেট ফুলিয়া রাবণের প্রাণ যায় আর কি! বেচারা রাবণ বালীর পায়ে পড়িয়া তাহার অনেক স্তব-স্তুতি করিয়া শেষে অব্যাহতি পায়।

দূর হইতে রাম-লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিয়া সুগ্রীবের বড়ই ভয় হইল। তিনি ভাবিলেন, বুঝি বালীরই কোন চর এখানে তাঁহার সন্ধানে আসিতেছে। তাই তিনি সঙ্গীদের মধ্যে হনুমানকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপু হনুমান, ঐ দুইজন লোক বালীর চর, না অন্য কেহ, তুমি কৌশলে জানিয়া আইস।"

হনুমান রাম, লক্ষ্মণের কাছে গিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিল, "মহাশয়গণ, আপনাদিগকে অতি সাধু ও শক্তিমান পুরুষ বলিয়া বোধ হইতেছে; আপনাদের পরিচয় পাইলে কৃতার্থ হই। এই পর্বতে বানররাজ সুগ্রীব থাকেন, তিনি বীর ও ধার্মিক; আপনাদের সহিত তিনি মিত্রতা করিতে চাহেন। আমি তাঁহার অনুচর, আমার নাম হনুমান।"

সুগ্রীবের নাম শুনিয়া রাম সুখী হইলেন এবং লক্ষণকে হনুমানের সহিত কথা কহিতে বলিলেন। লক্ষণ তখন হনুমানের নিকট আপনাদের পরিচয় দিয়া এবং সীতাহরণের

কথা জানাইয়া বলিলেন, "আমরাও সুগ্রীবের সহিত বন্ধুতা করিব বলিয়াই আসিতেছি; তোমার সহিত দেখা হওয়ায় ভালই হইল।"

হনুমান আনন্দিত হইয়া তাঁহাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিল এবং সীতার অন্বেষণে সুগ্রীব যে আগ্রহের সহিত তাঁহাদের সাহায্য করিবেন, তাহাও বলিল। আর তাঁহাদের দ্বারাও যে সুগ্রীবের উপকার হইবার আশা আছে, একথা জানাইতেও ভুলিল না।

ইহার পর হনুমান তাঁহাদিগকে সুগ্রীবের কাছে লইয়া চলিল। হনুমানের মুখে রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় পাইয়া সুগ্রীব যেমন সন্তুষ্ট হইলেন, সুগ্রীবকে দেখিয়া রাম, লক্ষ্মণেরও তেমনি আনন্দ হইল! তখন তাঁহারা অগ্নি সাক্ষী করিয়া হাতে হাত দিয়া মিত্রতা স্থাপন করিলেন।

তার পর সুগ্রীব বলিলেন, "বন্ধু, সেদিন একটা রাক্ষস একটি নারীকে চুরি করিয়া শূন্যপথ দিয়া যাইতেছিল। এখন আমি অনুমান করিতেছি, তিনিই আপনার পত্নী সীতা। তাঁহার বিলাপ শুনিয়া, বোধ করি, কেহই, চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারে নাই। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি গায়ের উড়ানী ও কয়েকখানি অলঙ্কার ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি আমি যত্ন করিয়া রাখিয়াছি। আপনার পত্নীর

বালী ও সুগ্রীবের মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গেল

অলঙ্কার কি না, দেখুন দেখি ?" এই বলিয়া সুগ্রীব সেগুলি আনাইয়া রাম, লক্ষ্মণকে দেখাইলেন।

সীতার গায়ের উড়ানী আর অলঙ্কার দেখিয়া রামের শোক দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। তখন সুগ্রীব বলিলেন, "বন্ধু, স্থির হউন, আমি সীতার উদ্ধারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব।" তাঁহার কথায় উৎসাহিত হইয়া রাম বলিলেন, "বন্ধু, আমিও বালীকে মারিয়া তোমাকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসাইব।"

রামের সাহস পাইয়া সুগ্রীব তখন কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া খুব আস্ফালন আরম্ভ করিলেন। বালী তাহা সহ্য করিবে কেন ? সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। অমনি দুইজনে মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরই সুগ্রীব নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন রাম বালীকে লক্ষ্য করিয়া এমন এক বাণ মারিলেন যে, তাঁহার আর দাঁড়াইয়া থাকাই ভার হইল।

বালীকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া রাম, লক্ষ্মণ তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। রামকে দেখিয়া বালীর সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "তোমাকে বীরের মধ্যে গণি না। তোমার সহিত আমার বিবাদ নয়, আমরা দুই ভাই যুদ্ধ করিতেছি, তুমি লুকাইয়া চোরের মত আমাকে বাণ মারিলে, এ কেমন কথা !"

রাম বালীকে বলিলেন, "তুমি আমাকে অনেক বকিলে ও লজ্জা দিলে; আর লজ্জা দিও না, আমাকে ক্ষমা করো। অগ্নি সাক্ষী করিয়া আমি সুগ্রীবের সহিত বন্ধুতা করিয়াছি। তুমি বড় ভাই হইয়াও শক্তির অহঙ্কারে তাহাকে অনেক লাঞ্ছনা দিয়াছ, রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া তাহার শত্রু হইয়াছে। অতএব সুগ্রীবের শত্রুকে বধ না করিয়া তাহার বন্ধুর কাজ কিরূপে করিব? যাহা হইয়াছে তাহা আর ফিরিবে না। আমার বরে তোমার সব পাপের ক্ষয় হইবে। তুমি 'মহেন্দ্র ভুবন' স্বর্গে যাইবে।"

বালীর পত্নী তারা ও পুত্র অঙ্গদ আসিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অনেক খেদ করিল। রাম তখন অঙ্গদকে যুবরাজ করিবেন স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে প্রবোধ দিলেন। বালীর মৃত্যু হইল!

ইহার পর রাম সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা ও অঙ্গদকে যুবরাজ করিলেন। এখন সুগ্রীব আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পৃথিবীর যেখানে যত বানর ছিল, দূত পাঠাইয়া তিনি সকলকে কিষ্কিন্ধ্যায় জড় করিলেন। তার পর বড় বড় সাহসী বানর পাঠাইয়া উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চারিদিকে সীতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল বানরদের মধ্যে হনুমান সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। রাম তাহার হাতে

একটি আংটি দিয়া বলিলেন, "যদি সীতার দেখা পাও, এই আংটি তাঁহাকে দিও। আংটি দেখিলেই তিনি তোমাকে আমার লোক বলিয়া বুঝিতে পারিবেন।"

বানরেরা মাঠ-ঘাট, বন-বাদাড়, পাহাড়-পর্বত এমন কি, আকাশ-পাতাল সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও সীতার সন্ধান পাইল না। ক্রমে তিন দিক হইতে দলে দলে বানর ফিরিতে আরম্ভ করিল; ফিরিল না শুধু দক্ষিণ দিকে যাহারা গিয়াছিল। সেই দলেই হনুমান, অঙ্গদ, জাম্ববান প্রভৃতি বড় বড় কয়েকটা সর্দার ছিল।

দক্ষিণ দিক্ হইতে কেহ ফিরিল না বটে, কিন্তু খাদ্য অভাব এবং দিনরাত্রি ঘুরিয়া তাহারা বড়ই দুর্বল হইয়া পড়িল। এদিকে দেখিতে দেখিতে এক মাস কাটিয়া গেল, তবুও সীতার সন্ধান হইল না। তাহারা দেশে ফিরিয়া রামের কাছে কি বলিবে, এই চিন্তায় কাতর হইয়া বিন্ধ্য পর্বতের নীচে গিয়া বসিল।

সেখানে বিন্ধ্য পর্বতের উপর জটায়ুর বড় ভাই পক্ষীরাজ সম্পাতি বাস করিত। সম্পাতি তাহাদের দুঃখের কথা শুনিয়া বলিল, "কিছুদিন আগে লঙ্কার রাবণ একটি স্ত্রীলোককে এই স্থান দিয়া চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। সেই মেয়েটি 'হা রাম', 'হা লক্ষ্মণ' বলিয়া খেদ করিতেছিল।

এই কথা শুনিয়া বানরদের দেহে যেন প্রাণ আসিল। তাহারা সম্পাতিকে পুনঃ পুনঃ নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহাদের কথার উত্তরে সম্পাতি বলিল, "দক্ষিণে যে সমুদ্র দেখিতেছ, প্রস্থে তাহা একশত যোজনের কম নহে। ইহারই অপর পারে লঙ্কাদ্বীপ; রাবণ সেই লঙ্কার রাজা।"

তখন তাহাদের বড় ভাবনা হইল। এত বড় সমুদ্র পার হওয়া কি সহজ কথা! জাম্ববান একে একে দলের প্রায় সকলকেই জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কাহারও এমন সাহস হইল না যে বলে, 'আমি সমুদ্র পার হইব।' শেষে জাম্ববান হনুমানের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাপু হনুমান, তুমি এখন চুপ করিয়া রহিয়াছ কেন? আমরা সকল কাজেই তোমার ভরসা করি।" হনুমান বলিল, "বেশ, আমিই এই কাজের ভার লইতেছি।" এই বলিয়া সে মহেন্দ্র-পর্বতে গিয়া উঠিল। কারণ সেখান হইতেই লাফ দিবার বিশেষ সুবিধা।

সুন্দরাকাণ্ড

পর্বত হইতে লাফ দিবার পূর্বে হনুমান তাহার দেহ ফুলাইয়া এমন ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিল যে, কাহার সাধ্য এদিকে চায়। দেবতারা পর্যন্ত অবাক্ হইলেন। তখন তামাসা দেখিবার জন্য তাঁহারা 'সুরসা' নামে এক নাগিনীকে পাঠাইয়া দিলেন। সে সমুদ্রের উপর আকাশ-পাতাল জোড়া প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া সকল পথ বন্ধ করিল। কিন্তু হনুমানের কাছে তাহার কৌশল খাটিল না। ইহার পর 'সিংহিকা' নামে একটা রাক্ষসীও ঠিক সেইরূপ হাঁ করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেও হনুমানকে আট্‌কাইতে পারিল না! সে রাক্ষসীর পেটের ভিতর ঢুকিয়া নাড়ি-ভুঁড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া গেল। শেষে সেই একশত যোজন পার হইয়া হনুমান যখন লঙ্কায় উপস্থিত হইল, তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পর সে মর্কটের ন্যায় ছোট আকার ধরিয়া লঙ্কার প্রতি ঘর-বাড়ী, বাগান-বাগিচা খোঁজ করিতে লাগিল। রাবণের অন্দরে ঢুকিয়া হনুমান ত একেবারে অবাক্। সোনার ঘর, রূপার সিঁড়ি, স্ফটিকের দরজা জানালা! আরও কত অদ্ভুত জিনিস যে সে দেখিল, তাহা আর কি বলিব! কিন্তু সীতাকে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। শেষে অশোক বনে আসিয়া হনুমান দেখিল, কয়েকটা রাক্ষসী একটি মেয়েকে ঘিরিয়া রহিয়াছে আর মেয়েটি মাথা নীচু করিয়া কাঁদিতেছে।

হনুমান ও সিংহিকা রাক্ষসী

হনুমানের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, যাঁহার সন্ধানে সে লঙ্কায় আসিয়াছে, ইনিই সেই সীতা। কিন্তু হঠাৎ সীতার কাছে না গিয়া সে একটা শিশুগাছের উপর লুকাইয়া রহিল। তার পর সুবিধামত তাঁহার সহিত দেখা করিয়া রামের কথা বলিল। রামের নাম শুনিয়াই সীতা চমকাইয়া উঠিলেন।

সীতা কিন্তু সহসা হনুমানকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার ভয় হইল, হয় ত বা রাবণই ছল করিয়া তাঁহাকে ভুলাইতে আসিয়াছে। যাহা হউক, শেষে রামের আংটি দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে, সে সত্য সত্যই রামের চর! তখন মনের দুঃখ চাপিয়া রাখা সীতার পক্ষে অসম্ভব হইল। তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া হনুমানও কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে সে সীতাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া রামের বিশ্বাসের জন্য তাঁহার মাথার মণিটি চাহিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

সীতার ত সন্ধান হইল; হনুমানের লঙ্কাতে আর কোনই কাজ ছিল না। কিন্তু শুধু শুধু না ফিরিয়া, সে রাবণের 'অশোক-বন' নামে সুন্দর উদ্যানটি নষ্ট করিতে লাগিল। যাহারা প্রহরী ছিল, তাহাদের কেহ কেহ হনুমানের হাতে মারা পড়িল, কেহ পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল।

সংবাদ পাইয়া রাবণ অনেক রাক্ষস-সৈন্য সঙ্গে দিয়া আপনার পুত্র বীরবর অক্ষকে পাঠাইয়া দিল। অক্ষ আট ঘোড়ার রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল। হনুমান এক এক চড়ে ক্রমে সেই আটটি ঘোড়াকেই যমালয়ে পাঠাইল। আর পা দুইখানা ধরিয়া অক্ষকে এমন এক আছাড় দিল যে, তাহার আর উঠিয়া যুদ্ধ করিবার শক্তি রহিল না।

রাবণ তখন একটু ভাবনায় পড়িল। একটা বানর আসিয়া এত বড় বড় রাক্ষস মারিয়া পুরী ছারখার করিতে বসিয়াছে, ইহা ত উপেক্ষার কথা নয়। কাজেই আপনার প্রিয়তম পুত্র ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে পাঠাইল। ইন্দ্রজিৎ যেমন তেমন যোদ্ধা নয়, তাঁহার ভয়ে দেবতারাও কাঁপেন। সেই মহাবীর আসিয়া হনুমানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং চক্ষের পলকে বাণে বাণে চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল কিন্তু হনুমানের এমনই কৌশল যে, সে একটা বাণও গায়ে লাগিতে দিল না। তখন ইন্দ্রজিৎ রাগে অধীর হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। এবার আর রক্ষা নাই। দেখিতে দেখিতে সেই অস্ত্র ছুটিয়া আসিয়া হনুমানকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিল।

হনুমান বাঁধা পড়িল; রাক্ষসদের আনন্দ দেখে কে!

পাছে আবার সে পলাইয়া যায়, সেই ভয়ে তাহারা মোটা মোটা কাছি আনিয়া হনুমানের সর্বাঙ্গে আরও বাঁধন দিতে লাগিল। কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্রের নিয়ম এই যে, অন্য কোন বাঁধন দিলে, সেই অস্ত্রের বাঁধন আপনিই খুলিয়া যায়। হনুমানের কপাল-গুণে তাহাই হইল। তথাপি মজা দেখিবার জন্য সে চুপ্ চাপ্ পড়িয়া রহিল আর মনে মনে হাসিতে লাগিল। এইরূপে বাঁধিয়া রাক্ষসেরা তাহাকে টানিয়া রাজসভায় লইয়া গেল। হনুমানের মুখে কথাটি নাই। সে কেবল মিট্ মিট্ করিয়া দেখিতে লাগিল—রাবণ রাজাটা কেমন। কিন্তু রাবণ তাহার উপরে হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিল, তাই নিজে কোন কথাই বলিল না। তাহার ইঙ্গিতে মন্ত্রী প্রহস্ত হনুমানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল এবং কেনই বা সে অশোক-বন নষ্ট করিয়াছে তাহা জানিতে চাহিল।

হনুমান রাবণের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার সহিত দেখা করিবার প্রয়োজন ছিল, তাই তোমার বাগান ভাঙ্গিয়াছি। আমি হনুমান, কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীবের দূত, রামের সেবক। তুমি এত বড় রাজা ; তোমার এ কেমন দুর্বুদ্ধি যে, পরের স্ত্রী চুরি করিয়া আনিলে! যদি ভাল চাও, মানে মানে রামের সীতা রামকে ফিরাইয়া দাও, নচেৎ কিছুতেই তোমার রক্ষা নাই!"

রাবণের আর সহ্য হইল না। সে রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে হুকুম দিল, "এখনই এই বানরটাকে কাটিয়া ফেল।" রাবণের ছোট ভাই বিভীষণ সেখানে ছিল। সে বলিল, "এই বানর দূত মাত্র; দূত অবধ্য, ইহাকে বরং অন্য কোনও রূপ দণ্ড দিতে পারেন।" রাবণ বলিল, "বেশ, সেই ভাল! তোমরা এক কাজ কর, উহার লেজে আগুন ধরাইয়া দাও।"

তখন রাক্ষসেরা নেক্‌ড়ায় তেল মাখাইয়া হনুমানের লেজে জড়াইতে আরম্ভ করিল। যত জড়ায় হনুমানের লেজ ততই বাড়িয়া চলে। লেজ শেষে আকাশে গিয়া ঠেকিল। তখন রাক্ষসেরা তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল। সেই আগুন যে কতটা জোরে জ্বলিয়াছিল এবং তাহা দেখিয়া রাক্ষসেরা যে কতগুলা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পার। শুধু তাহাই নয়, সেই অবস্থায় তাহারা হনুমানকে বাঁধিয়া লইয়া লঙ্কার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে লাগিল।

এ সংবাদ সীতার কানে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। সীতা কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, 'হে অগ্নিদেব, তুমি হনুমানকে রক্ষা কর, তাহার গায়ে যেন তাপ না লাগে।'

অগ্নিদেবের কৃপায় হনুমানের কোনই অনিষ্ট হইল না। সুবিধামত সে আপনার বাঁধন ছাড়াইয়া, উৎসাহে বীরমূর্তি ধরিয়া লঙ্কার ঘরে ঘরে লাফাইয়া বেড়াইতে লাগিল। অমনি

সারা লঙ্কা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কোথায় গেল রাক্ষসদের উল্লাস আর কোথায় গেল নৃত্য! রাক্ষসেরা তখন প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে। অন্যের কথা কি, স্বয়ং রাবণও 'হায়' 'হায়' করিয়া বুক চাপ্‌ড়াইতে লাগিল।

আগুনের বিস্তার দেখিয়া হনুমানের খুব ভয় হইল; কি জানি, সীতার যদি কিছু হইয়া থাকে। কিন্তু ঠিক সেই সময় কে যেন বলিল, 'ভয় নাই, সীতার কিছুই হয় নাই।'

এই কথা শুনিয়া হনুমানের আনন্দের আর সীমা রহিল না। এদিকে সেই আকাশ পর্যন্ত লেজের আগুন নিভাইবার জন্য হনুমান লেজটি সমুদ্রে গিয়া ডুবাইয়া রাখিল। কিন্তু লেজের আগুন নিভিল না। তখন হনুমান ভীত হইয়া সীতার নিকট গিয়া বলিল, "মা, আগুন যে নিভে না। কী উপায় করি?" সীতা বলিলেন, "বাছা, থুথু দিয়া আগুন নিভাও।"

তখন হনুমানের আর তর সহিতেছে না। সে আগুন শুদ্ধ গোটা লেজটি মুখের ভিতর পুরিয়া দিল। তাহাতে আগুন নিভিল বটে, কিন্তু হনুমানের মুখটি পুড়িয়া চিরকালের মত কালো হইয়া গেল। সাগরের জলে নিজের মুখ দেখিয়া হনুমানের যে কী দুঃখ হইল, তাহা সহজেই বুঝিতে পার! তারপর সীতা দেবীর নিকট বিদায় লইয়া সমুদ্রের তীরে একটা পাহাড়ের উপর গিয়া উঠিল।

আবার সেই ভীষণ লাফ! এক লাফে এপারে আসিয়া হনুমান সকলকে সীতার কথা, রাবণের কথা এবং লঙ্কার ঘরে ঘরে সে কেমন আগুন জ্বালাইয়াছিল, সেই সব কথা বলিল।

বানরদের তখন কি আনন্দ! উৎসাহে নাচিতে নাচিতে সকলে কিষ্কিন্ধ্যার দিকে চলিল। রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতি সেখানে অতি কষ্টে দিন কাটাইতেছিলেন; দূর হইতে বানরদের আনন্দ-কোলাহল শুনিয়া তাঁহারা যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন।

ইহার পর সীতার সংবাদ জানিতে আর কাহারও বাকি রহিল না। রাম আনন্দে হনুমানকে জড়াইয়া ধরিলেন আর সীতার মণিটি লইয়া গলায় পরিলেন। ইহাতে তাঁহার বুক জুড়াইল বটে কিন্তু চক্ষু দিয়া দর-দর ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

লঙ্কাকাণ্ড

এইবার যুদ্ধের পালা। রাম বলিলেন, "সুগ্রীব, হনুমান ত সীতার সন্ধান আনিল, এখন তাঁহার উদ্ধারের উপায় কর।" সুগ্রীব বলিলেন, "বন্ধু, দলে দলে বানর-সৈন্য লইয়া আমরা লঙ্কায় প্রবেশ করিতে পারিলে, সীতার উদ্ধারের ভাবনা কি? চলুন, সমুদ্রের ধারে গিয়া পড়ি।"

তখন সুগ্রীবের আদেশে সেখানে যত বানর ছিল, সব আসিয়া জড় হইল এবং মহাশব্দে আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া সমুদ্রের দিকে চলিল। কত কোটি কোটি বানর যে সাজিয়া আসিয়াছিল, কে তাহার সংখ্যা করে! সমুদ্রের তীরে রাশি রাশি বালুকার স্তূপ; সে বালুকার এক একটি কণা গণিয়া বরং শেষ করা যায়, কিন্তু বানরের সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব।

এদিকে রাবণ হনুমানের কাণ্ড যাহা দেখিয়াছিল, তাহাতে তাহার নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নহে। তাই মন্ত্রীদিগকে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে বসিল।

রাবণ বলিল, "রাম-লক্ষ্মণের দোষের কথা তোমরা জান। তাহাদিগকে দণ্ড দিবার জন্যই রামের পত্নী সীতাকে আমি কাড়িয়া আনিয়াছি! এখন রাম, লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া তাহার বানর-সেনার সাহায্যে

আমাকে পরাস্ত করিতে চায়। তাহারা যে কিরূপে সমুদ্র পার হইবে, বুঝি না! কিন্তু পারই যদি হয়, তবুও আমি সীতাকে ফিরাইয়া দিয়া তাহাদের কাছে হীনতা স্বীকার করিতে চাই না। ইহাতে তোমাদের কি মত?”

সভাস্থ সকলে বলিল, “মহারাজ, আপনি যেরূপ স্থির করিয়াছেন, তাহাই ঠিক। আপনি এত বড় বীর, সাক্ষাৎ যমের মত আপনার এত সৈন্য, আর এত অস্ত্র—এই সকল থাকিতে সামান্য মানুষ ও বানরকে ভয় করিয়া চলিতে হইবে? তাহা কিছুতেই হইতে পারে না! আর রাম, লক্ষ্মণকে মারিবার জন্য আপনাকেই বা যাইতে হইবে কেন? আমরাই সে ভার লইতেছি।”

রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণ খুব বড় বীর। তবে তাহার দোষ এই যে, সে ছয় মাস পড়িয়া ঘুমায়, একদিন জাগে। কুম্ভকর্ণ সেইদিন জাগিয়া সভায় আসিয়াছিল। সে বলিল, “সীতাকে চুরি করিয়া আনা মোটেই ভাল হয় নাই; তবে যখন কাজটা করিয়াই ফেলিয়াছেন, তখন যাহাতে আপনার মান রক্ষা হয়, তাহা করিব।” কিন্তু রাবণের ছোট ভাই বিভীষণ বড় ধার্মিক; সে বলিল, “মহারাজ আপনি সীতাকে আনিয়া ভাল কাজ করেন নাই। এখন রামের সীতা রামকে ফিরাইয়া দিন, সব গোল চুকিয়া যাক্। শত্রুকে ছোট মনে করা সুবুদ্ধির

কাজ নয়। রামকে আপনি সামান্য মানুষ ভাবিবেন না। তাঁহার সেনাপতিদের মধ্যে একা হনুমান আসিয়াই লঙ্কায় কি কাণ্ডটা করিয়া গেল, দেখিয়াছেন ত ?"

বিভীষণের কথা শুনিয়া রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিতের বড রাগ হইল। সে বলিল, "আমার পিতা ত্রিভুবনবিজয়ী বীর, আমি ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদ, তবু খুড়া বলেন, রামকে ভয় করিয়া চলিতে হইবে। এমন ভীরুর পরামর্শ আবার কেহ লয় ?" এই বলিয়া সে তাহার খুড়াকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিল।

রাবণও খুব চটিয়া গেল ; বলিল, "বুঝিয়াছি, আমাকে লোকের কাছে ছোট করাই তোর অভিপ্রায় ! তোর মত কপটকে লইয়া থাকা আর ঘরে কাল-সাপ পোষা—একই কথা। তোর জীবনে ধিক্ ! আমার ভাই বলিয়াই বাঁচিয়া গেলি, অন্য কেহ হইলে এই দণ্ডেই আমি তাহাকে মারিয়া ফেলিতাম। দূর হ—তোর মুখ যেন আর না দেখি।"

বিভীষণ রাবণের এইরূপ ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া রামের শরণাপন্ন হইল। রামও তাহাকে মিত্রভাবে গ্রহণ করিলেন। শুধু তাহাই নয়, বিভীষণকে তিনি এইরূপ আশ্বাসও দিলেন যে, দুরাত্মা রাবণকে বিনাশ করিয়া তাহাকেই লঙ্কার সিংহাসনে বসাইবেন।

এখন সৈন্য লইয়া রাম কিরূপে সমুদ্র পার হইবে,

তাহারই জল্পনা চলিতে লাগিল। রামের সৈন্যের মধ্যে নল খুব বড় কারিকর ছিল। গাছ-পাথর ফেলিয়া সে সমুদ্রের উপর এক সেতু প্রস্তুত করিয়া দিল। সেই সেতুর উপর দিয়া রামের সৈন্য লঙ্কায় আসিয়া পৌঁছিল। ব্যাপার দেখিয়া রাবণ ত অবাক! সে তখন শুক ও সারণ নামে তাহার দুই-জন মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, "তোমরা কৌশলে রামের সৈন্য-সংখ্যা ও তাহাদের বল-বিক্রম জানিয়া আইস।" রাজার আদেশে শুক ও সারণ ভয়ে-ভয়ে বানরের দলে গিয়া মিশিল। তাহারা এমন আশ্চর্য্য ছদ্মবেশ করিয়াছিল যে, কাহার সাধ্য চিনিতে পারে। কিন্তু বিভিষণের কাছে কোন কৌশলই খাটিল না। দেখিবামাত্র সে তাহাদিগকে ধরিয়া রামের নিকট পাঠাইয়া দিল। বেচারাদের তখন কি আর্ত্তনাদ তাহারা একবার রামের, একবার লক্ষ্মণের পায়ে লুটাইয়া পড়ে, আর যোড়হাতে তাঁহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকে।

শুক ও সারণের অবস্থা দেখিয়া রামের মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন, "ভয় নাই; যাহা দেখিতে আসিয়াছ, খুব ভাল করিয়া দেখিয়া তোমাদের রাজাকে গিয়া বল।"

এত সহজে যে নিষ্কৃতি পাইবে, শুক ও সারণ ইহা কল্পনাও করে নাই। মুক্তি পাইয়া তাহারা রামের দয়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে রাবণের কাছে ফিরিয়া গেল; আর বলিল,

"মহারাজ আপনার শত্রু রামকে সামান্য মানুষ মনে করিবেন না, আর তাঁহার সৈন্যও অসংখ্য। আপনি সীতাকে ফিরাইয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলুন।"

শুক ও সারণের কথায় রাবণ জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিল।

ইহার পর রাবণ কৌশলে সীতাকে বশে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। লঙ্কায় একটা যাদুকর রাক্ষস ছিল তাহার নাম 'বিদ্যুজ্জিহ্ব'। রাবণ তাহাকে বলিল, "তুমি রামের মাথার মত একটা মাথা আর রামের ধনুকের মত একটা ধনুক তৈয়ার করিয়া লইয়া সীতার কাছে চল; আমি তোমার পশ্চাতে যাইতেছি।"

রাজার যেমন আদেশ, বিদ্যুজ্জিহ্ব তাহাই করিল। সে অশোক-বনে সীতার কাছে যাইতে না যাইতেই রাবণও সেখানে গিয়া উপস্থিত। রাবণ সীতাকে সেই মুণ্ড আর ধনুক দেখাইয়া বলিল, "সীতা, এই দেখ রামের মুণ্ড আর ধনুক। রামকে আমার সৈন্যেরা মারিয়া ফেলিয়াছে। এখন আর ভাবিয়া কি ফল! তুমি আমার রাণী হইয়া থাকিবে এস।"

সীতা উহা সত্য সত্যই রামের মুণ্ড ভাবিয়া শোকে একেবারে অধীর হইলেন। বিভীষণের স্ত্রী সরমা সীতাকে

বড়ই ভালবাসিত। দুষ্ট রাবণ চলিয়া যাইবার পর সরমা আসিয়া বলিল, "সীতা তুমি স্থির হও। রাবণের সব কথাই মিথ্যা। এই মাত্র আমি নিজে রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া আসিতেছি।" সরমার আশ্বাসবাক্যে সীতা কতকটা শান্ত হইলেন।

এদিকে রাম তখন রাবণের পুরী ও তাহার সৈন্যবল দেখিবার জন্য সুবেল পর্বতে আরোহণ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতি সকলেই তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন। এই পর্বতে উঠিলেই লঙ্কার সকল বস্তুই চক্ষে পড়ে। এমন কি, পুরীর মধ্যে যে রাজ-সিংহাসন, সেটিও দেখা যায়।

সীতাকে ভয় দেখাইয়া রাবণ সবেমাত্র সিংহাসনে আসিয়া বসিয়াছে, এমন সময় সুগ্রীব তাহাকে দেখিতে পাইলেন। অমনি রাগে আগুন হইয়া এক লাফে তাহার ঘাড়ে গিয়া পড়িলেন। তখন দুইজনে কি ভীষণ মল্লযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে রাবণের দুর্দশার অবধি রহিল না। সুগ্রীব তাহার মুকুট কাড়িয়া লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পর রাম অঙ্গদকে পাঠাইলেন। এই অঙ্গদের পিতা বালী একবার রাবণকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়াছিল। অঙ্গদ রাবণের কাছে গিয়া বলিল, "বালী রাজার সহিত তোমার বেশ আলাপ- পরিচয় হইয়াছিল, শুনিয়াছি।

আমি সেই বালীর পুত্র অঙ্গদ, শ্রীরামের দূত। হয়, সীতাকে ফিরাইয়া দিয়া রামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, না হয়, যুদ্ধ করিয়া সবংশে মর।”

অঙ্গদের কথায় রাবণ রাগে কাঁপিতে লাগিল। তাহার আদেশে তখনই চারিটা রাক্ষস অঙ্গদকে বাঁধিতে গেল। কিন্তু বাঁধা আর হইল না। অঙ্গদ তাহাদিগকে বগলে পুরিয়া এক লাফে একটা বাড়ীর ছাদে গিয়া বসিল। তারপর দুই তিন আছাড়ে সকলগুলির ঘাড় ভাঙ্গিয়া রামের নিকট ফিরিয়া আসিল।

সুগ্রীব ও অঙ্গদের কার্য্যে রাম যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন। রাবণ কিন্তু এই দারুণ অপমানে মর্মাহত হইয়া নিজের প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে ডাকিয়া যুদ্ধসজ্জা করিতে আদেশ দিল। ঘরে ঘরে তখন যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল। চারিদিকেই হাঁক-ডাক আর চীৎকার। রাক্ষসদের এতই উৎসাহ যেন রাম-লক্ষ্মণকে পাইলে তাহারা লুফিয়া খায়।

পরদিন প্রাতেই তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাদ্যের ধ্বনি, অস্ত্রের শব্দ এবং রাক্ষস-বানরের কোলাহলে লঙ্কাপুরী কাঁপিয়া উঠিল।

সেদিন প্রথমে যাহারা যুদ্ধে আসিয়াছিল তাহাদের জন্য রাম, লক্ষ্মণের অস্ত্র ধরিবার প্রয়োজন হয় নাই কিন্তু শেষে ইন্দ্রজিৎ আসিয়া যখন হুঙ্কার ছাড়িল, তখন আর তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। সে মেঘের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করিত। তাই তাহার সঙ্গে কেহই আঁটিয়া উঠিত না।

সে আসিয়াই আড়াল হইতে চোখা চোখা বাণ মারিয়া সকলকে অস্থির করিয়া তুলিল। রাম, লক্ষ্মণ তাহাকে দেখিতে পান না, যুদ্ধ করিবেন কিরূপে? সুযোগ বুঝিয়া ইন্দ্রজিৎ 'নাগপাশ' বাণ মারিল। অমনি সেই বাণের মুখে হাজার হাজার সাপ আসিয়া রাম, লক্ষ্মণকে জড়াইয়া কাবু করিয়া ফেলিল। দুই ভাই মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগকে পড়িতে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ তাড়াতাড়ি রাবণকে গিয়া বলিল, "আর কোন চিন্তা নাই; রাম, লক্ষ্মণ দুই ভাইকেই মারিয়া আসিয়াছে।" এ সংবাদে রাবণ কিরূপ সন্তুষ্ট হইল, বুঝিতেই পার।

এদিকে বানরদলে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতি শোকে একেবারে অবসন্ন! দলের মধ্যে একমাত্র বিভীষণই বুঝিয়াছিল যে, রাম-লক্ষ্মণ জীবিত আছেন। সে শান্তভাবে সকলকে আশ্বাস দিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ গরুড় আসিয়া উপস্থিত! গরুড়ের ভয়ে সাপগুলা রাম, লক্ষ্মণকে ছাড়িয়া কোথায় যে লুকাইল, তাহার ঠিকানা নাই! তাঁহারা সুস্থ হইয়া উঠিলে বানরগণের লম্ফ ঝম্ফ আর কোলাহলে আবার লঙ্কা যেন টলমল করিতে লাগিল।

রাবণ ত ভাবিয়াই আকুল। রাম, লক্ষ্মণ মরিয়াছে তবে আবার বানরদের এত আনন্দ কিসের? শেষে খবর লইয়া যখন জানিল, দুই ভাই নাগ-পাশের বাঁধন কাটাইয়া উঠিয়া বসিয়াছেন, তখন তাহার দুঃখের সীমা রহিল না।

ইহার পর রাবণ যাহাকে পাঠাইল, তাহার নাম ধূম্রাক্ষ; কিন্তু

সে আসিতে না আসিতেই হনুমান প্রথমে তাহার রথখানা, শেষে তাহার মাথাটা গুঁড়া করিয়া দিল।

ধূম্রাক্ষের পর বজ্রদংষ্ট্র, বজ্রদংষ্ট্রের পর অকম্পন, অকম্পনের পর প্রহস্ত, এমন আরও অনেক বীর আসিল। ইহাদের এক একটা ঠিক যেন যমদূত! গায়ে কাহারও হাজার হাতীর বল, কাহারও বা দশ হাজার হাতীর বল! কিন্তু বানরদের লাথি, চড়, ঘুসি ও কীল এড়াইয়া ইহাদের কাহাকেও ঘরে ফিরিতে হইল না।

এইবার রাবণ নিজে আসিল, আর এমন ভয়ানক যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, নল, নীল অঙ্গদ কেহই তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করিল না। লক্ষ্মণ যে এত বড় যোদ্ধা, তাঁহাকেও বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল। শেষে কিন্তু রাম রাবণকে এমন শিক্ষা দিলেন যে, সে পলাইতে পারিলে বাঁচে। তাহার দুর্দশা দেখিয়া রাম বলিলেন, "রাবণ, আজ তোমাকে বড় শ্রান্ত দেখিতেছি। যাও, ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর। কাল আবার আসিয়া যুদ্ধ করিও!" বাস্তবিক, রাবণের তখন এমন অবস্থা নয় যে, দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করে। কাজেই সে আর কথাটি না কহিয়া পলায়ন করিল।

যুদ্ধে এত বড় বড় সেনাপতি, এত দলে দলে রাক্ষস মরিয়াছে, তবুও রাবণ তেমন ভয় পায় নাই কিন্তু এবার নিজে হারিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল; সে তাড়াতাড়ি কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার জন্য লোক পাঠাইল।

কুম্ভকর্ণ একাই যেন একশত। তাহার পায়ের দাপে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে; সে যেদিকে দাঁড়ায়, সেই দিকের আকাশ একে-

বাঘে ঢাকিয়া যায়! তাহার ক্ষুধা এত বেশী যে, একদিনেই সে বনের সমস্ত জন্তুকে শেষ করিতে পারে। ব্রহ্মার শাপে সে ছয় মাস ঘুমাইয়া একদিন মাত্র জাগে, তাই রক্ষা। নচেৎ কাহাকেও আর বাঁচিয়া থাকিতে হইত না।

রাজার আদেশে হাজার হাজার রাক্ষস কুম্ভকর্ণকে জাগাইতে ছুটিল, কিন্তু তাহার ঘুম কি সহজে ভাঙ্গে! কত ঢাক-ঢোল, কাঁসর-ঘণ্টাই না বাজান হইল; তাহার নাকে, কানে কত কলসী জলই না ঢালা হইল, তাহার বুকে পেটে কত কুড়ুল-খন্তার খোঁচাই না মারা হইল! তবু কিছুতেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিল না। শেষে যখন পালে পালে হাতী আনিয়া তাহার পিঠের উপর চড়াইয়া দেওয়া হইল, তখন সে উঠিয়া বসিল।

রাবণ যখন এই কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধে পাঠাইল, তখন ভয়ে বড় বড় বানরেরাও একেবারে আড়ষ্ট! সে ত রাক্ষস নয়, যেন একটা লোহার পাহাড়! তাহার পায়ের চাপেই কত বানর পিষিয়া গেল—নিশ্বাসের ঝড়েই কত বানর উড়িয়া গেল! তাহা ছাড়া যে গুলোকে সে হাতের কাছে পাইল, ধরিয়া টপাটপ্ সেগুলোকে মুখে পুরিতে লাগিল। সুগ্রীব অঙ্গদ প্রভৃতি কত চেষ্টাই না করিল কিন্তু সাধ্য কি যে তাহার সহিত আঁটিয়া উঠে! বড় বড় গাছ ছুড়িয়া মারিলে, সে শূল দিয়া তাহা কাটিয়া ফেলে; পাথর ছুড়িয়া মারিলে, তাহার গায়ে লাগিয়া গুঁড়া হইয়া যায়! লক্ষ্মণ যুদ্ধ করিতে আসিলে, সে হাসিয়া টিট্কারি দিয়া বলিল, "কেন বাপু মিছামিছি প্রাণটা হারাইবে! ঘরে গিয়া তোমার দাদাকে

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ

পাঠাইয়া দাও।” রাক্ষসের নিতান্ত মরণ-দশা উপস্থিত না হইলে লক্ষ্মণকে এত বড় কথা বলিতে কখনও সাহস করিত না। যাহা হউক, শেষে রাম আসিয়া অস্ত্র ধরিলেন।

এবার যুদ্ধ বাধিল বটে। সেই লোহার পাহাড় যেন শেল, শূল আর গদার কারখানা। তাহা হইতে হাওয়াই বাজীর মত চারিদিকে অস্ত্র ছুটিতে লাগিল। কিন্তু রামের বাণের কাছে সে সব অস্ত্র লাগে কোথায়। রাম এক একটি বাণ ছাড়েন, আর রাক্ষসের বড় বড় অস্ত্র গুঁড়া হইতে থাকে। এই ভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে রাম এক বাণে কুম্ভকর্ণের হাত, আর এক বাণে তাহার পা কাটিয়া ফেলিলেন। তবু কি সে জব্দ হয়! সেই অবস্থায় হাঁ করিয়া রামকে গিলিতে আসিল। তখন রাম ইন্দ্র-অস্ত্রে তাহার মাথা উড়াইয়া দিলেন।

কুম্ভকর্ণের দুই ছেলে ছিল—কুম্ভ আর নিকুম্ভ। তাহারাও প্রায় বাপের মতই বীর। কিন্তু যুদ্ধে আসিয়া তাহাদিগকেও রামের হাতে প্রাণ দিতে হইল।

তার পর ইন্দ্রজিৎ আবার আসিল এবং পূর্বের ন্যায় চোরা বাণে রাম, লক্ষ্মণকে এমন কঠিন আঘাত করিল যে, দুই জনেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। বানর মহলে আবার শোকের রোল উঠিল। সুগ্রীব, অঙ্গদ, বিভীষণ সকলেই খুব ভয় পাইলেন। কিন্তু জাম্ববান কিছুমাত্র অস্থির না হইয়া হনুমানকে বুঝাইয়া বলিল, “বাপু, শুধু শুধু কাঁদিয়া ফল কি? তুমি এখনই ঔষধের জন্য যাও। হিমালয় পার হইয়াই সম্মুখে ঋষভ-পর্বত দেখিবে।

তাহার পর কৈলাস-পর্বত! সেই ঋষভ আর কৈলাসের মাঝখানে 'বিশল্যকরণী,' 'মৃতসঞ্জীবনী,' 'সুবর্ণকরণী,' ও 'সন্ধানী' এই চারি রকম ঔষধের গাছ আছে। সেই সকল ঔষধে রাম, লক্ষ্মণ বাঁচিয়া উঠিবেন। যাও বাপু, শীঘ্র গিয়া ঔষধগুলি লইয়া আইস।"

হনুমানকে আর দ্বিতীয়বার বলিতে হইল না। সে কিরূপ লাফাইতে পারে, তাহা তোমরা জান। সেইরূপ এক লাফে হিমালয় পার হওয়া তাহার পক্ষে আর আশ্চর্য কি! কিন্তু ঔষধের পর্বতে উপস্থিত হইয়া হনুমান মহা মুস্কিলে পড়িয়া গেল— কোন মতেই গাছগুলি চিনিতে পারিল না। তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া সমস্ত পর্বতটাকেই তুলিয়া সে মাথায় করিয়া লইয়া আসিল। সেই সকল ঔষধের গন্ধে রাম, লক্ষ্মণ উঠিয়া বসিলেন। অমনি "জয় জয়" ধ্বনিতে চারিদিক ভরিয়া গেল।

এইবার হাজার হাজার রাক্ষস লইয়া দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা, মহোদর, অতিকায়, মকরাক্ষ, বীরবাহু, ভস্মলোচন প্রভৃতি লঙ্কার যত বাছা বাছা সেনাপতি আসিল, কিন্তু ঝড়ের আগে যেমন শুক্‌নো পাতা উড়ে, রাম, লক্ষ্মণ ঠিক তেমনই করিয়া তাহাদের মাথা উড়াইয়া দিলেন।

তখন ইন্দ্রজিৎ এক ফন্দি আঁটিল। সে এক যজ্ঞ করিত, তাহার নাম 'নিকুম্ভিলা যজ্ঞ'। এই যজ্ঞ না করিয়া সে মেঘের আড়ালে যাইতে পারিত না। যজ্ঞ শেষ করিয়া একবার সেখানে লুকাইতে পারিলে, কাহার সাধ্য তাহাকে মারে!

ইন্দ্রজিৎ ভাবিল, একটা নকল সীতা তৈয়ার করিয়া যুদ্ধস্থলে
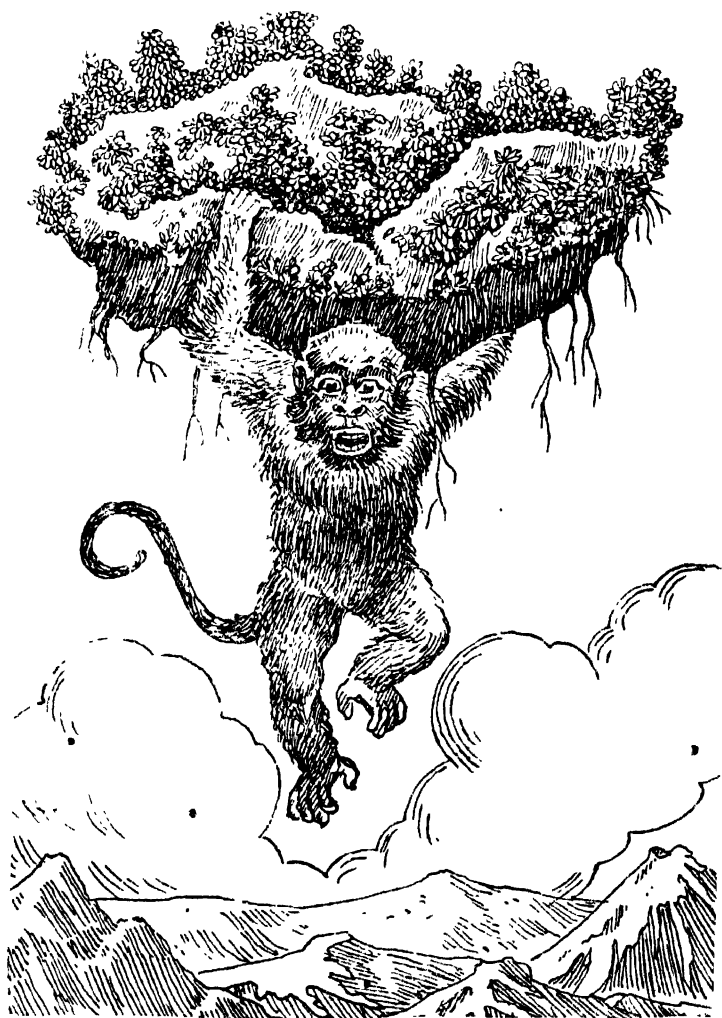
হনুমানের পর্বত আনয়ন

কাটিতে পারিলে, রাম, লক্ষ্মণ—দুই ভাই নিশ্চিতই উহাকে প্রকৃত সীতা ভাবিয়া মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে বসিবে। সেই অবসরে সে যজ্ঞটি সারিয়া লইবে। এই ভাবিয়া ইন্দ্রজিৎ সত্যই একটি মায়া-সীতা তৈয়ার করিয়া বানরদের সম্মুখে কাটিয়া ফেলিল। হনুমান প্রভৃতি আসল কথা বুঝিল না ; তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া রাম, লক্ষ্মণকে সেই কথা বলিল। তাঁহারাও কিছু না বুঝিয়া হা-হুতাস করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রজিতের কৌশলে তাঁহারা ভুলিলেন বটে কিন্তু বিভীষণকে ভুলান সহজ নহে। সে সবই বুঝিল। মায়া-সীতা কাটিয়া ইন্দ্রজিৎ সবে যজ্ঞ করিতে বসিয়াছে, এমন সময় বিভীষণ লক্ষ্মণ ও হনুমানকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। দরজায় যাহারা পাহারা দিতেছিল, হনুমানকে দেখিয়াই দে ছুট্। কিন্তু ছুটিয়া পলাইবে কোথায় ? হনুমান এক একটাকে ধরে আর টুঁটি ছিঁড়িয়া ফেলে। তখন সেখানটায় কেবল চীৎকার আর আর্তনাদ।

ইন্দ্রজিৎ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর যে ভয়ানক যুদ্ধ বাধিল, এমন আর কেহ দেখে নাই। বাণে বাণে চারিদিক অন্ধকার। যুদ্ধস্থল রক্তে একেবারে লাল। তবুও যুদ্ধের শেষ নাই। ইহার মধ্যে একেবার ইন্দ্রজিতের রথটির ঘোড়া কাটা গেল। সে আবার নূতন রথে চড়িয়া আসিল। লক্ষ্মণ তাহাও কাটিয়া ফেলিলেন। তখন বিনা রথেই সে এমন আশ্চর্য যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, সকলের তাক লাগিয়া গেল। শেষে কিন্তু লক্ষ্মণ ইন্দ্র-অস্ত্রে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

অমনি চারিদিকে "জয়, লক্ষ্মণের জয়" ধ্বনি পড়িয়া গেল। সেই শব্দে রাবণের বুক কাঁপিয়া উঠিল। হায় হায়, কি সর্বনাশ!

লঙ্কায় আর বীর নাই; বাকি শুধু রাবণ। রাবণ মরিলেই যুদ্ধ শেষ হয়! কিন্তু তাহাকে মারা কি এতই সহজ। শোকে, দুঃখে ও রাগে সে একেবারে মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দ্রজিৎ মায়া সীতা কাটিয়াছিল; গায়ের ঝাল মিটাইবার জন্য সে আসল সীতাকেই কাটিতে গেল। তখন মন্ত্রীরা বলিল, "মহারাজ, আপনার মত বীরের যোগ্য কাজ এ নয়। রাম, লক্ষ্মণ আপনার শত্রু, তাহাদিগকেই দণ্ড দেওয়া সর্বাগ্রে উচিত।"

মন্ত্রীদের কথায় লজ্জিত হইয়া রাবণ সীতাকে ছাড়িয়া যুদ্ধস্থলে ছুটিয়া আসিল আর ভয়ঙ্কর শক্তি ও শূল লইয়া এমন তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, বড় বড় বানরেরাও ভয়ে জড়সড়। বিভীষণকে দেখিয়া সে একটা শক্তি ছুড়িয়া মারিল, লক্ষ্মণ তাহা কাটিয়া ফেলিলেন; কিন্তু রাবণের আর একটা শক্তি লক্ষ্মণ এড়াইতে পারিলেন না—তাহার তেজে নিজেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। হনুমানকে আবার ঔষধ আনিতে যাইতে হইল। ঔষধের গুণে এবারও লক্ষ্মণ ভাল হইয়া উঠিলেন।

এইবার রাম-রাবণের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে এমন ভীষণ যুদ্ধ যে, দেবতারা পর্যন্ত আসিয়া জড় হইলেন। অসুরেরাও আসিল। রামের জয়ে দেবতারা নাচিয়া উঠেন, রাবণের জয়ে অসুরেরা লাফাইতে থাকে।

রাবণের এক হাতে শক্তি আর এক হাতে শূল; রামের হাতে

বিশাল ধনুক। যে শূল দেখিলে দেবতারাও ভয়ে কাঁপিয়া উঠেন রাম তেমন কত শূল কাটিলেন, আবার যে সকল বাণে সৃষ্টি লোপ পায়, রাবণ তেমন কত বাণ এড়াইল। এইভাবে অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলিল। রাবণ এক একবার ঘুরিয়া পড়িয়া যায় ; সকলে ভাবে, সে মারিয়াছে, কিন্তু একটু পরেই লাফাইয়া উঠিয়া আবার যুদ্ধ করিতে থাকে। শেষে রাম ব্রহ্মাস্ত্র লইলেন। আর কি রক্ষা আছে? দেখিতে দেখিতে সেই মহা অস্ত্র ছুটিয়া গিয়া রাবণের মাথা কাটিয়া ফিরিয়া আসিলা। এবার রাবণ সত্যই মরিল।

রাবণের মৃত্যুতে সকলে কিরূপে সুখী হইল, বুঝিতেই পার! দেবতারা পর্যন্ত পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এদিকে লঙ্কার ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠিল। বিভীষণ ভাল কথা বলিয়াছিল বলিয়া রাবণ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল ; ভাইয়ের শোকে আজ সেই বিভীষণও কাঁদিয়া আকুল হইল। তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া তবে শান্ত করিতে হইল! শেষে রাম বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাইলেন।

হনুমানের মুখে রাবণের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সীতা প্রথমটা যেন হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া পড়িলেন ; কিছুক্ষণ তাঁহার মুখ দিয়া কথাই সরিল না। শেষে কতকটা সুস্থ হইলে, তিনি বলিলেন, "বাছা, আজ তুমি যে সু-খবর দিলে, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি, আমার এমন কিছুই নাই।" হনুমান বলিল, "মা, তোমাকে সুখী দেখিতে পাইলাম, ইহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। আমি আর কিছুই চাহি না।"

এই কথায় সীতার কর্ণ যেন জুড়াইয়া গেল। ইহার পর তিনি মনে মনে কতই সুখের কল্পনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! রামের কাছে আসিয়া যাহা শুনিলেন, তাহা অপেক্ষা রাক্ষসের হাতে মৃত্যুই বরং তাঁহার পক্ষে ভাল ছিল। রাম বলিলেন, "সীতা, আমার কাজ আমি করিলাম, এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার। এতদিন তুমি দুষ্ট রাবণের ঘরে ছিলে, সেখানে কি ভাবে বাস করিয়াছ, কিছুই জানি না। এ অবস্থায় আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি না।"

সীতা জীবনে অনেক দুঃখ সহিয়াছেন কিন্তু রামের কথায় আজ তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া গেল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "লক্ষ্মণ, আর আমি সহ্য করিতে পারি না; আমার মৃত্যুই ভাল। তুমি আগুন জ্বালিয়া দাও!"

সীতার দুঃখে লক্ষ্মণের দুই চক্ষে ধারা বহিতেছিল। তিনি আগুন জ্বালিয়া দিলে সীতা সেই আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে স্বয়ং অগ্নিদেব সেই ভয়ানক আগুনের ভিতর হইতে সীতাকে লইয়া বাহির হইলেন। কি আশ্চর্য, সীতার গায়ের কাপড়খানি পর্য্যন্ত পুড়ে নাই। অগ্নিদেব বলিলেন, "এমন সতী-লক্ষ্মী আর নাই। সীতার দেহে কিংবা মনে এক বিন্দু পাপ থাকিলে, আমি ইহাকে গ্রাস করিতাম।" তখন রাম আদর করিয়া সীতাকে গ্রহণ করিলেন।

তারপর সকলে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। চৌদ্দ বৎসর পরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে দেখিয়া লোকে আনন্দে নাচিয়া

উঠিল। কৌশল্যা, সুমিত্রা, ভরত, শত্রুঘ্ন সকলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। ঘরে ঘরে অবিশ্রান্ত নৃত্য-গীত চলিতে লাগিল।

অবশেষে শুভদিন দেখিয়া বশিষ্ঠ নারদ প্রভৃতি মুনিগণ রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এত দিনের পর প্রজাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল।

উত্তরাকাণ্ড

রামের মত রাজা আর সীতার মত রাণী পাইয়া অযোধ্যা-বাসিগণ যে কত সুখী হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহাতে রাজা-রাণীরই বা আনন্দ কত! কিন্তু হায়! চিরদুঃখিনী সীতার ভাগ্যে এ সুখ দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া গেল। রাজা হইবার কিছুকাল পরে রাম হঠাৎ একদিন শুনিতে পাইলেন যে, তিনি পুনরায় সীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রজাদের মধ্যে কেহ কেহ না কি তাঁহার, বিচার-বিবেচনার দোষ দিয়া থাকে। সীতার সম্বন্ধে লোকের এইরূপ সন্দেহ রামের বক্ষে বজ্রের ন্যায় আঘাত করিল। দারুণ শোকে ক্রমে তিনি বড়ই বিচলিত হইলেন এবং প্রজারঞ্জনের জন্য সীতাকে বনে রাখিয়া আসিতে লক্ষ্মণের প্রতি আদেশ করিলেন। হায়, অভাগিনী সীতা। না জানি, বিধাতা তাঁহার কপালে আরও কত দুঃখ লিখিয়াছেন!

লক্ষ্মণ যখন পূর্ণগর্ভা সীতাকে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া আসিলেন, তখন সীতার হাহাকারে বনের পশু পক্ষীদেরও চক্ষু ভিজিয়া গিয়াছিল। মহর্ষি যদি সে সময়ে পিতার ন্যায় স্নেহে তাঁহাকে আদর করিয়া না লইতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণরক্ষাই কঠিন হইয়া উঠিত!

সেই আশ্রমে সীতার দুইটি যমজ পুত্র হইল। বাল্মীকি তাহাদের নাম রাখিলেন—কুশ ও লব। শিশু দুইটি একটু বড় হইলে, মুনি তাহাদিগকে যেমন নানা শাস্ত্র ও ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা

দিলেন, তেমনই অতি সুন্দর ভাবে রাম-চরিত গান করিতেও শিখাইলেন। আশ্রমে আশ্রমে কুশ ও লব যখন গান করিয়া বেড়াইত, তখন সেই সকল স্থান আনন্দময় হইয়া উঠিত।

এদিকে রামের দিনগুলি এতকাল যে কি ভাবে কাটিতেছিল, তাহা ভাবিলে চক্ষে জল আসে। যে সীতা তাঁহার প্রাণের চেয়েও প্রিয়, যাঁহাকে এক মুহূর্ত না দেখিলে তিনি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া রাম বাঁচিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঁচিয়াও যেন তাঁহাকে মৃত্যু-যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হইতেছিল।

সীতাকে বনে পাঠাইবার বার বৎসর পরে রাম পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের পরামর্শে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। ক্রমে রাজা-মহারাজা, মুনি-ঋষি, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে অযোধ্যা ভরিয়া গেল; ঢাক-ঢোল, কাঁসর-ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনিতে চারিদিক্ গম্-গম্ করিতে লাগিল।

যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, গৈরিক বসন পরিয়া মাথায় জটা বাঁধিয়া কুশ-লব বাল্মীকির সহিত রামের সভায় উপস্থিত হইল আর বীণা বাজাইয়া এমন মধুর স্বরে রামায়ণ-গান করিতে লাগিল যে, কেহই চোখের জল রাখিতে পারিলেন না।

আহা, শিশু দুইটি দেখিতে কি সুন্দর! ঠিক যেন আর দুইটি রাম। সকলে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। কৌশল্যা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কুশ ও লবকে বুকে টানিয়া লইয়া ব্যাকুলভাবে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন তাহারা একবাক্যে বলিল, "আমরা বাল্মীকির শিষ্য;

তাঁহারই আশ্রমে থাকি। আমাদের মায়ের নাম সীতা।" সীতার নাম শুনিয়াই কৌশল্যা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

রামের কথা আর কি বলিব! একদিকে কুশ ও লবকে দেখিয়া তাঁহার যেমন আনন্দ আর একদিকে বিনা দোষে সীতাকে ত্যাগ করিয়াছেন ভাবিয়া তেমনই বিষম পরিতাপ! এই সুযোগে বাল্মীকি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "রাম, আমার অনুরোধে তুমি সীতাকে গ্রহণ কর। মা-লক্ষ্মীকে আর কষ্ট দিও না" রাম তখন নিতান্ত করুণস্বরে বলিলেন, "দেব, সীতার প্রতি অবিচার করিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে! প্রজাদের মুখ চাহিয়াই আমি এই অন্যায় কাজ করিয়াছি। তাহারা অসুখী না হইলে, আমি এখনই সীতাকে আদর করিয়া লইব।"

রামের কথা শুনিয়া বাল্মীকি তখনই সীতাকে রাজসভায় আনাইলেন এবং সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "ইনিই মা জানকী। এমন সতী-লক্ষ্মী আর হয় না। আমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, ইঁহার দেহে কিংবা মনে বিন্দু মাত্র পাপ নাই। এ কথা যদি মিথ্যা হয় তবে আমার তপস্যার সমস্ত ফল যেন নষ্ট হইয়া যায়। এখন আপনারা আপত্তি না করিলে রাম ইঁহাকে গ্রহণ করিয়া সুখী হইতে পারেন।"

অনেক দিনের পর সীতাকে দেখিয়া চারিদিকে যেন আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। বাল্মীকির কথায় সকলেই সুখী, কেবল, কয়েকটি দুষ্ট লোক মাথা হেট্ করিয়া রহিল।

এই ব্যাপারে বেশ বুঝা গেল, সীতার সম্বন্ধে এখনও কোন

কোন লোকের সন্দেহ দূর হয় নাই। তখন অশ্রুধারায় রামের বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল। এ অপমান সীতা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার সমস্ত অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল। তিনি কম্পিতস্বরে বলিলেন, "মা বসুমতী, তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার কোলে গিয়া সকল জ্বালা জুড়াই।"—তাঁহার মুখের কথা না ফুরাইতেই মাতা পৃথিবী সেখানে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। সীতার সকল যন্ত্রনার অবসান হইল।

সীতার মৃত্যুতে রাম যে কি দারুণ আঘাত পাইলেন, তাহা বলিবার নয়। কুশ আর লব মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল! সকলে "হায় হায়!" করিতে লাগিল এই ভয়ানক শোকের মধ্যে কোন রকমে যজ্ঞ শেষ করিয়া রাম অতি কষ্টে তাঁহার দুঃখের জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

এইভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল! অবশেষে একদিন স্বয়ং কালপুরুষ আসিয়া রামের সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার সহিত গোপনে আমার কিছু কথা আছে। যদি প্রতিজ্ঞা করেন, আমাদের কথা-বার্তার সময় যে কেহ আপনার নিকটে আসিবে, তাহাকেই আপনি ত্যাগ করিবেন, তবেই আমি সে কথা বলিতে পারি।"

কালপুরুষের কথায় সম্মত হইয়া রাম তাঁহাকে লইয়া একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণের উপর দ্বার রক্ষার ভার রহিল।

এমন সময় হঠাৎ দুর্বাসা আসিয়া উপস্থিত। মুনিদের মধ্যে এমন রাগী আর কেহই ছিলেন না। তিনি আসিয়াই রামের

রামের সহিত দেখা করিতে চাহিলেন। লক্ষ্মণ বিনয় করিয়া বলিলেন, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া একটু অপেক্ষা করুন; তিনি বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছেন!" এ কথায় দুর্বাসা রাগে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "যদি এখনই আমাকে রামের নিকট লইয়া না যাও, তবে শাপ দিয়া সমস্ত অযোধ্যাবাসীকে ভস্ম করিয়া ফেলিব।" লক্ষ্মণ বিশেষ ভয় পাইলেন। আপনাকে রক্ষা করিতে গেলে বহু নিরীহ লোক মারা যায়। কাজে কাজেই তিনি আর দেরী না করিয়া দুর্বাসার সংবাদ লইয়া রামের সহিত দেখা করিলেন।

তখন দুর্বাসা রামের নিকট গিয়া তাঁহার আসিবার কারণ জানাইলেন। রামও তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিতে ত্রুটি করিলেন না। দুর্বাসা চলিয়া যাইলে, লক্ষ্মণের কথা ভাবিয়া রাম বজ্রাহতের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া লক্ষ্মণের ভয় হইল। তিনি ছুটিয়া আসিয়া রামের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দাদা, এ সময় ব্যকুল হইলে চলিবে কেন? পিতৃ-সত্য পালনের জন্য বনবাসে থাকিয়া তুমি আমাদিগকে সত্যের মর্য্যাদা শিখাইয়াছ, আমাকে আজ ত্যাগ করিয়া সত্যের গৌরব রক্ষা কর।"

রামের প্রাণে তখন যে কি বেদনা, তাহা কে বুঝিবে? সীতাকে ছাড়িয়াও বাঁচিয়া থাকা বরং সম্ভব, কিন্তু প্রাণের

ভাই লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিয়া তিনি কিরূপে বাঁচিবেন? ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। সে দৃশ্য লক্ষ্মণ আর সহ্য করিতে পারিলেন না! রামের পদধূলি মস্তকে লইয়া তিনি রাজপুরী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন এবং সরযূর পবিত্র জলে নামিয়া ধ্যানস্থ হইয়া দেহ বিসর্জন করিলেন।

ইহার পর রাম আর বেশীদিন রাজত্ব করেন নাই একে একে সকলেই চলিয়া গেলেন; কিসের মায়ায় তিনি আর বাঁচিয়া থাকিবেন? ক্রমে তাঁহার দেহের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল।—

"কিছুদিন মাত্র যপি' এইভাবে রাম।
অনন্ত শান্তির কোলে লভিলা বিরাম॥
যদিও আপনি চির-নিদ্রায় নিদ্রিত।
রহিল অনন্ত কীর্তি চির জাগরিত॥"

—সমাপ্ত—

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকার, ৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কালকাতা-১২ হইতে
প্রকাশিত ও সেঞ্চুরী প্রেস, ২১, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত